প্রবন্ধ

সূচি

আসনু— চুরি করি ৫৮৯
আধুনিক উর্দূ কবিতা ৫৯৪
সতের শতাব্দীর 'হেয়কেয়ি' কবিতা ৫৯৯
কামাল চৌধুরীর কবিতা ৬০৩
নাট্যসাহিত্য ৬০৭
শেক্সপীয়ার ৬১১
রবীন্দ্রনাথের নাটক : উপলব্ধির রূপান্তর ৬১৬
নজরুল-কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ ৬২০
আধুনিক নাটক ৬২৩
কেন লিখি নি ৬২৮
চোর ৬৩১

আসুন—চুরি করি!

সাহিত্যে চুরি, চুরি নয়।

ছোটকালে আম্মা ঘুমিয়ে পড়লে, নিঃশব্দে আঁচল খুলে চাবিটা তুলে নিয়ে খাবারের আলমারি খুলে ফেলেছি; তারপর তার চেয়ে সন্তর্পণে মুখের মাংসপেশীর অপূর্ব কৌশলযুক্ত দ্রুত সঞ্চালনে খাদ্য-অখাদ্য সামনে যা পেয়েছি, তাই পাকস্থলীর পথে রওনা করাতে গিয়ে অকস্মাৎ কারও কোমল করাঙ্গুলীর দৃঢ় আকর্ষণ কানের পেছনে বোধ করা মাত্র 'ওঃ গেছি' বলে ছুটে পালিয়েছি। কিন্তু তাই বলে নিজেকে কি চোর বলে আপার সামনে স্বীকার করেছি?

আমরা যারা সাহিত্য-সেবা করার জন্যে উদগ্রীব—জি, মডেস্টি বলে ভুল করবেন না—সবাই সদা এক একজন শিশু। অত্যন্ত সরল, নিষ্পাপ, অবুঝ। আর এই বিরাট বিশ্বসাহিত্যের খাদ্য রূপকটা যতদূরে সম্ভব বাছাই হয়ে ইংরেজি সাহিত্যের মিট্‌সেফে বন্ধ করা আছে। সমালোচকদের অসতর্ক ঝিমুনির ফাঁকে ফাঁকে আমরা যদি কখনো এক-আধ টুকরো মুখে পুরে—কানে আকর্ষণ বোধ করার অপমানটাকে দৈহিক ব্যথার মতোই তুচ্ছ মনে করে—বাংলা ভাষার পাকস্থলীতে রসাল করে চালান করে দি', তবে কি সেটা গুণাহ হলো?

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় সবাই তা করেছেন। তবে তফাৎ এই যে, কেউ এক সাথে কচি গালে অনেকগুলো পুরে দিতে গিয়া ফুলো-গালে ধরা পড়ে যান মিটসেফের বড্ড কাছে।

কেউ বেশি খেয়ে হজম করতে পারেন না। কেউ আবার ধরা পড়েন বিশ্বাসঘাতকতার ফলে। তখন উত্তর হয়; কখনো সম্পূর্ণ নীরবতা, কখনো—একেবারে অস্বীকার, কখনো নিছক শুকনো হাসি।

এবার এই চুরি-খেলার শিশু-কৌশলের সিঁড়িগুলো দেখা যাক। আমাদের সবার মন যখন শিশু—আর আমার মতো অখ্যাতনামা গোত্রের দলে যারা, তাদেরও যখন এ-পদাঙ্কই অনুসরণ করতে হবে, তখন অভিজ্ঞ খ্যাতনামাদের জ্বলন্ত গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ সামনে রেখে পথ চলতে শেখাটাই বোধ হয় সবচেয়ে কম বিপজ্জনক হবে।

বুদ্ধদেব বসু মহাশয় সাহিত্যে এ বিষয়ে অমর উদাহরণ। হাক্‌সলী থেকে কীরকম বে-পরোয়া ও নির্ভুল বাংলায় অনুবাদ করে স্থানে-অস্থানে কঠোর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছড়িয়ে নিজস্ব বলে চালিয়ে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে অত্যন্ত রূঢ় ভাবে 'শনিবারের চিঠি' বলেছে। 'শনিবারের চিঠি'র এই অতি কঠিন ও মর্মান্তিক ব্যাঙ্গের ভঙ্গী সত্যিই আমায় ব্যথা দিয়েছে। এ-শুধু হৃদয়হীনতার প্রকাশ নয়, বরঞ্চ প্রগতিশীল বলে যে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য দাবি করে, তার যুগ-গতির সাথে অগ্রসর-পথে এ-একটা বিরাট কলঙ্ক।

অবশ্য আমরা যারা এখনও বড্ড বেশি কাঁচা, তারা প্রথম ধাপেই এতটা সাহস করতে পারি না। 'আস্তে আস্তে চোটো' তারা মিঞার এই মহাগম্ভীর সত্য-বাণী আমাদের সর্বক্ষণ মনে রেখে পথ এগুতে হবে।

বুদ্ধদেববাবুর মৌলিক পন্থায় একটা সংক্ষিপ্ত ও প্রাথমিক কার্যসূচি তৈরি করেছি, আমাদের কার্যোপযোগী করে। আশা আছে সফলকাম হবই।

আপনি একটা বিদেশী বই পড়ুন—ইংরেজি, উর্দু, পারসি— যেটা আপনার আসে। কোনো একটা বিশেষ রচনা পছন্দ কর নিন। অন্য একটা রচনার টেক্‌নিক টেনে এনে ফিট্ করে দিন এটার। তারপর ঐ বইটা না দেখে নিজের ভাষায় স্বচ্ছন্দ গতিতে লিখে যান ঐ প্লটটা। ব্যাস্ গল্প বা প্রবন্ধ যা কিছু তৈরি হলো সেটা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং আপনার। কপি করে কোনো সম্পাদককে পাঠিয়ে দিন, দেখবেন উচ্চ প্রশংসিত হয়ে সেটা ছাপা হয়ে গেছে।

এ পর্যন্ত গেল আঁচল থেকে চাবি চুরি করে মিটসেফ থেকে খাবার হাত করা। চাই কি মুখে পুরে দেয়া পর্যন্ত!

এরপর আপার আবির্ভাব ও কর্ণমূলে দুর্দান্ত আকর্ষণটা আকস্মিক সংঘাত। দৈব পক্ষে থাকলে অঘটনটা না-ও ঘটতে পারে। আর যদি হয়, তাও এড়াবার নিখুঁত উপায় অচিন্ত্যবাবু ওঁর নিজের অজানতেই আমাদের বাৎলে দিয়েছেন।

বিদেশী বই থেকে প্লট্ আপনার হলো। সেটা মনের পেছনে রেখে সেই বিদেশী চরিত্রের অস্তিত্বকে ভুলে যান। টেনে হিঁচড়ে নিজের চেনা দু'একটা মুখ এনে দাঁড় করিয়ে দিন শূন্য স্থানগুলোতে। বিদেশীতে আলখাল্লা থাকলে, দিশীতে আপনি পাঞ্জাবি করে দিন—সুট্ থাকলে আচকান ইত্যাদি। ইংরেজিতে আপনি যদি অর্গান পেলেন, বাংলায় হার্মেনিয়াম কি কাঁসর ঘণ্টা পর্যন্ত নাবতে পারেন। উর্দুতে যদি রাবড়ি পেলেন তবে ইংরেজিতে চক্‌লেট রাখুন, আবার বাংলায় সময় বুঝে ডালমুট অবধি বসিয়ে দিতে পারেন।

ব্যবসা ক্ষেত্রে সার্বজনীন সুবিধার জন্যে একটা কাটালগ তৈরি করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু যুদ্ধের বাজারে কাগজের অভাব আর ঘরোয়া খোঁচায় সময় করে উঠতে পারি নি। তবুও দু'একটা টুকটাক নির্দেশ-চিহ্ন সাময়িক কাজ চলবার জন্যে উল্লেখ করে যেতে পারি।

অচিন্ত্যবাবুর 'মুখে-দেখা' গল্পটা যে-টা বেরিয়ে ছিল দেড়-দু বছর আগে 'সোনালী ফসল' নামক ছোটদের বার্ষিকী-তে—এই নতুন স্কুলের অনুসরণকারীদের গোড়াপত্তনের কাজে বিশেষ সাহায্য করবে। হ্যামসুনের 'ভ্যাগাবন্ড' [বেদে] বইটার প্রথম দিকের-ই দুটো ভিক্ষুক সংঘটিত একটা ঘণ্ট দু'একবার পড়ুন। তারপর এই বাংলা সংস্করণটাও পড়ুন। আপনার নিজের চোখ-কে নিজেরই বিশ্বেস করতে ইচ্ছে করবে না। দেখবেন এক, তবু মনে হবে দু'। অথবা দেখবেন দু' তবু মনে হবে এক। তারপর যখন অচিন্ত্যবাবুর সাহিত্য-ক্ষেত্রের সুনামটাকে উল্টো করে ধরে নলের মতো করে ঝুলিয়ে তার ভেতর দিয়ে গল্পটা পড়বেন দু'ভাষাতেই—মনে হবে কেলিয়োডোস্কোপের ফাঁক দিয়ে আপনি বুঝি মাত্র দু'টুকরো কাঁচকে নেড়ে-চেড়ে বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস উপলব্ধি করাব এক নৈসর্গিক আনন্দ উপভোগ করছেন।

এর চেয়ে-ও উঁচু স্তরের চুরি আছে।

যেখানে অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরে আপাকে পর্যন্ত হাতে-হাতে ধরার পরও চুপ করে থাকতে হয়। যে রকম ঘরে অনেক সময় ঘটে—যখন কোনো বয়স্থ ভদ্রলোক ঐ লোভের বশবর্তী হয়ে মিটসেফ দ্বারা আর্ষিত হন। তখন আপাকে হয় না দেখার ভান করতে হয় অথবা এমন একটা ভাব দেখাতে হয়, যার অর্থ ভদ্রলোক নিশ্চয় নিজের জন্যে নয়; মহত্ত্বর কোনো পরোপকার করার বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে-ই ও কাজে হাত দিয়েছেন।

এই ধরনের চুরি করার জন্য আমাদের প্রত্যেককে গড়ে তুলতে হবে, নিজেদের মধ্যে বিপুল নৈতিক বল। যার শক্তি দিয়ে আমরা সত্যকে ধরা দিয়েও নিজেদের অসত্যকে ঠুনকো হতে দেবো না।

আসুন, দেরী না করে আমরাও সে চেষ্টাই করি। সামনে আমাদের দিগন্ত-বিস্তৃত সৌভাগ্যের হাতছানি। এ-যুগের মূলমন্ত্র মেনে আমরাও সেই উদারচেতা সাহিত্যিকদের বিদেশী জুতোর অনুসরণ করি : তাঁদের যারা চুরি কোরেও চোর নন। সাহিত্যে এ হচ্ছে অত্যধিক জ্ঞানের ফলে ভিন্ন কোনো বৃহৎ সাহিত্যের প্রভাব-ফল। যদি শিগ্‌গির কোনো দিনে সত্যি এই নতুন ওয়েসিসে সাঁতার কেঁটে চমকপ্রদ কোনো সাফল্যের তীরে গিয়ে উঠতে পারি তখন সবার আগে যাঁরা আমাদের এই সফলতার জন্যে মোবারকবাদ করতে পারেন তাঁরা হচ্ছেন : শিবরামবাবু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণবাবু ও কাজি আফসারউদদিন সাহেব।

এই গেল গদ্য-ইতিহাস।

আধুনিক কবিতার ব্যাপারে আরো জমকালো! এখানে সময় নষ্টের ভয় নেই, লেখকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার ন্যায়সংগত যুক্তি নেই, এমন কি পাশে অভিধান খুলে শব্দ বের করে দেবার লোক থাকলে বানান পর্যন্ত ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। নির্জ্ঞান মনের ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অজস্র ঘটনা টুকরোকে পাঁচফোড়ন দেয়া অপটু হস্তের নিরামিষ তরকারির মতো, ব্যাকরণবর্জিত একঝাঁক দুর্বোধ্য শব্দেব অসমতল পিণ্ড দ্বারা, কিছুটা ছন্দহীন চিৎকার করে গেলেই হলো!

আপনি হয়ত ভাবছেন যে তাহলে চুরি কবার প্রশ্নই ওঠে না। সবাইত ওবকম ভাবে মৌলিক হতে পারে। কিন্তু একথাটা মনে বাখবেন, যাঁরা চুরি কবেন সাধারণত তাঁরা যাবা চুরি কবে না তাদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।

অনেক যখন জ্ঞানগর্ভ, যুক্তপূর্ণ কথা বলে তখন তাদের লোকজনের জাতের সাথে আরেকজনের মতের পার্থক্য খুঁজে বের করা বোধ হয় খুব কষ্টকর নয়। কিন্তু যখন অর্থহীন বকওয়াসে সবাই মুখব তখন দু'জনের মতের মধ্যে তফাৎ বের করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। বস্তুতে বস্তুতে তুলনা চলে কিন্তু বস্তুত্বহীনতার মাঝে সে প্রশ্নই ওঠে না। ১০৫ ডিগ্রি জ্বরে রুগীর প্রলাপ আর স্বাস্থ্যবান কোনো পাগল উচ্চারিত উত্তপ্ত মস্তিষ্কের বিবৃতির মাঝে প্রকৃতি বা অর্থগত কোনো ভিন্নতা নেই।

এমনি একটা আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের পর এক অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান আধুনিক কবির দল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধারায় বাখার জন্যে এক নতুন রোশনাই জ্বাললেন।

এঁদের-ই আমরা পথপ্রদর্শক বলে মানব।

হাতেখড়ি দেবার আগে আমরা দু'একটা নমুনা ভাল করে বুঝে নি। প্রণালীটা তা হলে অনেকখানি পানি হয়ে আসবে।

ওস্তাদজি বুদ্ধদেব বাবুব-ই একটা কবিতা নেয়া যাক। নাম "Do you remember an inn Miranda ?"

লক্ষ করুন নাম রাখা হোলো ইংরেজিতে। সুরঙ্গমা নামে কোনো নারী নিয়ে একটা অতি সুন্দর আষাঢ়ে কবিতা। ঐ নামেই মূল কবিতাটা ইংরেজিতে হিলেরি বেলকেব লেখা। এখন এই বাংলা কবিতাটা পড়াব সময় যাঁবা মূল কবিতাটা ইংরেজিতে পড়েন নি তাঁবা এর

সৌন্দর্যকে প্রশংসা করবেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। আর মাথা নোয়াবেন নাম রাখার অপরূপ অভিনব ভঙ্গীর মৌলিকতার কাছে। যাঁরা মূল রচনা পড়েছেন তাঁরা চুপ থাকতে এই জন্যে বাধ্য সে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ত ঐ নামের মাঝেই দেয়া আছে।

এরই একটু সহজ ও পরিবর্ধিত কায়দা থেকে আমরা বের করব—ধরা পড়েও আপাকে-চুপ-করানো চুরি। পদ্য আখড়ায় নেমে এই হলো আমাদের প্রথম প্যাঁচ শিক্ষা !

এর চেয়ে আরেকটু উঁচু স্তরের চুরি অপেক্ষাকৃত কলাপূর্ণ ও পাপশূন্য।

সেটা হচ্ছে এই, যেমন আপনি একটা আধুনিক কবিতা লেখার জন্যে বেতাব হয়ে উঠেছেন। তাগিদটা সম্পাদকের হোক কিম্বা প্রিয়ার আবদার-ই হোক! কাগজ, কলম, সম্ভবপর হলে একটা অভিধান আর অবশ্য অবশ্য একটা বিদেশী কবিতা সঙ্কলন—এই জিনিস ক'টা সাথে নিয়ে বসলেন। অদ্ভুত দেখে একটা চমকপ্রদ কবিতা আপনি পছন্দ করে নিলেন ঐ বিদেশী সঙ্কলন থেকে। এখানে অবশ্য আমরা ধরে নিয়েছি যে মোটামুটিভাবে আরো অনেকের মতো একটু-আধটু আধুনিক কবিতা লেখার ক্ষমতা আপনারও আছে। এখন চেষ্টা শুধু কী করে অত্যাধিকভাবে উগ্রমূর্তি ধরা যায়। যাক্ একটা কিম্ভূতকিমাকার কবিতা আপনি বেছে নিয়ে মাত্র একবার পড়লেন। তারপর বইটা বন্ধ করে রেখে আপনি আরম্ভ করলেন একটা কিছু নাড়তে [অভিধানই সবচেয়ে উপকারী!]—মনের পেছনে অর্ধেক বোঝা-না-বোঝা কবিতার বিদেশী কঙ্কালটা তখন বিকৃত উলঙ্গ মূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে খাঁটি স্বদেশী প্রেতখানায়। তারপর আচমকা নিয়ে পড়লেন কাগজ আর কলম-কে। তারপব ক'মিনিট মাত্র সময় খরচ করে আপনি যে কবিতাটার উদ্ধার করবেন সেটা হবে কেবল আপনার। এ একেবাবে গ্যারান্টি দেয়া।

কৌশলটা ভাল করে আয়ত্ত করার সবচেয়ে সহজ উপায়ও আমি বেব কবেছি। চেষ্টা করে দেখবেন। অনুপান বাৎলে দিচ্ছি।

বুদ্ধদেব বাবুর 'আফ্রিকা' কবিতাটা তিনবার পড়ুন। তারপব মনটা ক্লেদাক্ত হয়ে উঠলে খুব মনোযোগ দিয়ে এফ ও ম্যানের 'আফ্রিকা' কবিতাটাও একবার পড়ুন। তারপর ফেনাময় সাবান দিয়ে গোছল করে ফেলুন। কৌশলটা আপনার কাছে নিছক বাঁ-হাতেব প্যাঁচ বলে মনে হবে। বাথরুম থেকে বেরুবামাত্র অনুভব করবেন আপনার নতুন জ্ঞানলাভের এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর স্ফূর্তি!

আরেকটু কম বিপজ্জনক ও উন্নত ধরনের একটা টেকনিক্ আমি কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শিখেছি। মানে তাঁর-ই একটা কবিতা পড়তে পড়েত নিছক সুদৃষ্টির কল্যাণেই এই কলাটা আমি আকস্মিকভাবে আয়ত্ত করেছি।

এই ভঙ্গিটাই আমার মতে বোধহয় সবচেয়ে বেশি সুরুচিসম্পন্ন। পূর্ণভাবে এই কৌশলকে হাত করতে হলে আমাদের মনটাকে করে তুলতে হবে স্পঞ্জের মতো স্থিতিস্থাপক। বোধশক্তিটাকে, ফাঁপা দুটুকরো আভরণ মাঝে কারবন টুকরোর মতো সহজে গ্রহণ উপযোগী করে তুলতে হবে। অনাবশ্যকভাবে ইমোশনাল হবার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

আরেকটু স্থূল ভাষায় বলছি।

ধরুন আপনি একটা বিদেশী ভাষার শিকার নিয়ে আপ্লুত হয়ে পড়লেন—তারপর হতে হতে উপচে ওঠা ভাবের ধাক্কায় এত বেশী আত্মহারা হয়ে পড়লেন যে, যেটা থেকে প্রথম রস গ্রহণ

করেন সেই মূল কল্পনাটাকেই প্রায় ভুলে যান। এই বেমালুম ভুলে যাওয়ার মধ্যেই কৌশলটা লুকোনো।

অথবা এমন হয় যে যখন আপনার স্মরণশক্তির কুবুদ্ধি। বারবার করে অন্যের রচা মূল কল্পনাটা আপনাকে মনে করিয়ে দিয়ে স্ব-আনন্দের রশ্মিটাকে ম্লান করে দিতে চায়, তখন আপনি ঝপ্ করে চটেমটে, অগণন তরঙ্গে নৃত্যময়ী সামরিক জোশে এসে একটা কিছু লিখে ফেলেন।

সত্যি বলতে কি এই যে একটা মানসিক—ঝোড়া পরিস্থিতি প্রসূত রচনা, তার স্থানে-স্থানে হয়ত মূল বিদেশী রচনাটার মুখ ভেংচি থাকবে—তবুও জিনিসটা সম্পূর্ণ আপনার হবে। তার জন্যে আপনি কষ্ট করেছেন। কাজেই স্বচ্ছন্দে আপনি মূল রচয়িতার আংশিক বাহাদুরিটা অত্যন্ত ন্যায্যভাবে চেপে যেতে পারেন।

হয়ত কামাক্ষীবাবু কিছুই জানেন না এ বিষয় সম্বন্ধে। তবু আমরা আমাদের কাজে হাত পাকাবার জন্যে ও'র কবিতা থেকেই একটা উদাহরণ আদর্শ হিসেবে তৈরি করে নোবো। যে-কবিতাটার কাছে আমি পরোক্ষভাবে ঋণী এই জ্ঞানটুকুর জন্যে।

লুই গেল্ডিং-এর Come Hills বলে কবিতায় প্রথমে পাহাড়কে ডাকা হয়েছে জেগে ওঠার জন্যে। নিথর পাহাড়কে আহ্বান করা হয়েছে রুদ্রনৃত্যে চঞ্চল হয়ে উঠতে। আর কামাক্ষীবাবু সুর তুললেন, "হে মৈনাক, সৈনিক হও।" এখানে রূপ পেল শুধু, অনির্দিষ্ট যে-কোনো-পাহাড়ে নয়। ভাবালুতা ঠমক দিয়ে অলঙ্কার পরল। বলা হোলো, মৈনাক। শুধু রুদ্র নৃত্য নয়, কঙ্কালে কঙ্কালে ঠোকাঠুকি নয়, তাই ইমোশনাল ঝঙ্কার শুনলাম "সৈনিক হও"!

ছোটবেলার একটা কথা আমার মনে পড়ল। আলমারি থেকে খাবার চুরি করার পরও মাঝে মাঝে এমন হতো যে, কোনোক্রমে হয়ত আপার হাত এড়িয়ে বারান্দা পর্যন্ত এসেছি কিন্তু তক্ষুণি হয়ত কোনো আত্মীয় এসে ছোঁ মেরে কিংবা আব্দার অথবা জোর করেই বসাল ভাগ। এমন কি হয়ত বা আমারই অলক্ষ্যে হাত বুলিয়ে নেয়।

এই পথেরই পথিক আমাদেরই একজন চলনসইভাবে খ্যাতনামা আধুনিক কবি। তাঁর দু'একটা কবিতা, কামাক্ষীবাবুর এক ঝাঁক কবিতা থেকে বাছাই করা কতগুলো শব্দ বা একশব্দ অর্থে ব্যবহৃত শব্দসমষ্টির কৌশল সহকারে নতুন সারিতে সাজানো। ব্যাপারটা রসায়নশাস্ত্রে আইসেমেরিজেমের মতো অনেকটা। তবে কবির স্বাভাবিক আড়ষ্টতা এবং দুর্বোধ্যতা তাঁকে অনেকখানি দুশমন-কবল থেকে বাঁচিয়েছে। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করেই নামটা উল্লেখ করতে পারলুম না। সে জন্যে মাফ চাইছি। তবে কৌশলটা মৌলিক এবং সহজবোধ্য।

আধুনিক উর্দু কবিতা

বৈচিত্র্য সন্ধানী আধুনিক উর্দূ কবিদের মধ্যে রাজা মেহদে আলী খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গদ্যকবিতায় আচমকা এসে ইনি এমন কতগুলো অভিনব এবং অদ্ভুত বাঁক দিয়ে গেছেন যে, সেটা সমালোচক-মহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটা দৃঢ়, সুস্পষ্ট ছাপ এঁকে দিয়েছে।

ব্যঙ্গ রসের পরিবেশনেই যেন এঁর কবিতার প্রধান লক্ষ্য। তবে পন্থাটা একটু আলাদা ধরনের। মানুষের খুব দুর্বল তন্ত্রীতে ইনি আঘাত দেবেন, খুব আস্তে, খুব ধীরে। সে স্পর্শ এত মোলায়েমভাবে এসে আঘাত করে যে, তখন সেটা satire-এর সূক্ষ্ম পীড়াদায়ক অনুভূতির বদলে, জাগিয়ে তুলে একটা প্রাণ-মাতানো সরল হাস্যধ্বনি। সাধারণত রসিকতা জিনিসটা যার ওপর করা হয়, তাকে একটু কষ্ট স্বীকার করতেই হয়— রসটা স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম তার বাছবিচার না করেই। আর যারা দর্শক হয় : তারা উপভোগ করে আনন্দ, চোখে, মুখে প্রকাশ করে [অন্তর-উৎফুল্লতার শারীরিক উচ্ছ্বাস। মেহদে আলী খাঁর কবিতার কথাগুলো এমন একটা শিশুসুলভ সরল যে, কবিতার মাঝে কোনো রুদ্র প্রকৃতির ছোঁয়াচ থাকলেও তাব গাম্ভীর্য স্বীকার করতে মন চায় না। কবিতার শব্দের মাঝখানে যেন শিশু-ভাবুকেব মিটিমিটি চাউনি উঁকি দেয়! ফলে কবিতা পড়ার পরবর্তীকালে যে পরিস্থিতির উদ্রেক হয় সেটা বিশুদ্ধ আনন্দের—ক্ষমাসুন্দর তৃপ্তিব। যাঁদের লক্ষ্য করে কবিতার বিদ্রূপ তাঁদেরও এই মনোভাব, আর যাঁরা হাততালির দর্শক তাদেরও।

'নাগ্নীর মেয়ের দোয়া' কবিতায় বলছেন :

ও আল্লাহ। আজ এ-নিস্তব্ধ অরণ্যে
যখন কেউ কোনো দিকে নেই,
তখন তুমি আমার দর্শন দাও,
দর্শন দাও!
যদি না দাও,
তবে এ জেনো
ছোট্ট একটি মেয়ে
তোমার ওপর রাগ করবে...

'ছোট্ট একটি মেয়ে' দুহাত ওপরে তুলে ঐকান্তিক নিবিড় সুরে মোনাজাত করছে—ছবিটা যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এই কবিতার শিশুর যুক্তিহীন মনের ক্ষুব্ধতা দেখে, একাগ্র চিত্তের নালিশ শুনে—সমস্ত মন ভরে জেগে ওঠে উপচে ওঠা হাসির জোয়ার। সঙ্কীর্ণ সব বাঁধন টুটে বেরিয়ে আসে ক্ষমাসুন্দর স্ফূর্তি।

মেহদে আলী খাঁ ভণ্ড মৌলভিদের বিদ্রূপ করতে ভীষণ ভালবাসেন। সেই সব বক-ধার্মিকদের নিয়ে এঁর কবিতা যাঁরা দিনের আলোয় সদাসর্বদা বিশ্বস্রষ্টার নামে গদ্-গদ্ চিত্ত আর

লোকচক্ষুর অন্তরালে আঁধার ঘনিয়ে এলেই মুখোস খুলে স্ব-স্ব পাপ চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেন। এই শ্রেণীর লোক এত হীনভাবে ভীরু যে, নিঃসঙ্কোচ পাপ করতে ভয় পায়!

একটা কল্পিত তুলনামূলক দৃশ্যের সৃষ্টি করে আশ্চর্যজনকভাবে এই ভাবটাকেই প্রাণ দিয়েছেন, মেহদে আলী খাঁ—

খট্ খট্ খট্!
মৌলানা,
একটিবার খুলে দাও না
জান্নাতের এ দ্বার।
রাত হয়েছে অনেক
কেউ এখন দেখছে না
মৌলানা,
একটিবার খুলে দাও না
জান্নাতের এ দ্বার!...
খট্ খট্ খট্ !
এত রাতে
চুপে চুপে। মৌলানা,
এসেছি টিপে দিতে
তোমার পা,
মৌলানা, একটিবার খুলে দাও না
জান্নাতের এ দ্বার।

অস্বাভাবিক এক দৃশ্যের সৃষ্টি, বলবার ভঙ্গী হাস্যকর! তবু ভাষার সাবলীল গতির পেছনে থেকে থেকে ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে সুতীব্র ব্যঙ্গচ্ছটা। জান্নাত, শয়তান ইত্যাদি অতি গম্ভীর কাব্যসামগ্রীর পাশেই কবির স্বাভাবিক রসিক-মনপ্রসূত হালকা ঠাট্টার সুরটা satire-এর প্রকৃত সূক্ষ্ম কলাকে ক্ষুণ্ন করলেও তার গতিকে মন্থর করে নি।

এমনিতর দৃশ্য আঁকতে তিনি সিদ্ধহস্ত। একাঙ্কিকা নাটকে যেমন সম্রাট অষ্টম হেনরি এবং রাজ্ঞী ক্যাথ্‌রিনের শান্-শওকত-প্রবেশ ঘটিয়ে আপনি যদি তারপর অবতারণা করেন একটা সামান্য পারিবারিক ডিম সেদ্ধ নিয়ে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী তুমুল ঝগড়ার দৃশ্য, তবে সেটা যেমন চূড়ান্ত, হাসারসের খোরাক যোগাবে, ঠিক তেমনি বিপরীতমুখে দুটো কল্পনা রেখার আকস্মিক সংঘাত ঘটিয়ে মেহদে আলী খাঁ গড়ে তোলেন তাঁর কবিতার ব্যঙ্গরস। অঘটনীয়, অকল্পনীয় কতগুলো ঘটনা তিনি তাঁর নাছোড়বান্দা কণ্ঠস্বরে এমন করে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলবেন যে, তখন ব্যাপারটার বাস্তবতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠার আগেই মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে রস পান করতে।

কল্পনার গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই 'আমি' ব্যবহারে বর্ণনা করা হয়েছে। কবিতার নাম—'কোয়ামতে হট্টরোল'। আরম্ভতেই লঘু-গুরু রসের প্রকাশ। তারপর :

প্রায় দশদিন শায়িত আমি বিছানায়,
কেয়ামত এসে গেছে।

ইস্রাফিল জোরে, আরো জোরে
সিঙ্গা ফুঁকছে।
মৃতদেহগুলো আরেকবার
দাঁড়ায় দু'পায়ে,
তারপর যে যেদিকে পারে
লম্বা দেয়—ভাগে দূরে!
আমি আমার ময়লা
ছেঁড়া-ফাঁটা লেপ সরিয়ে
এক চক্ষু বার করি,
আর বলি :
'আরে এই। এত চ্যাঁচাচ্ছিস কেন ?'
তারপরই আবার নিদ্রা।...

নিছক একটা প্রলাপের মতো, বিকারগ্রস্ত মনের বিকৃত স্বীকারোক্তির মতো। তবুও প্রথমে ভদ্রলোকের দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তারপর তন্ত্রীগুলো একটু নিস্তেজ হয়ে আসতেই কেমন একটা অস্বস্তিময় নির্লিপ্ত অবজ্ঞার হাসি জেগে উঠতে চায় ঠোঁটের কোণায়। এ যেন একটা হিংস্র নখর হাত খামচে দেবে বলে এগোতে থাকে আপনার দিকে, তারপব কাছে এসে হঠাৎ আপনার ভয়-শিহরিত দেহে দিয়ে বসে শুধু কাতুকুতু!

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে তিনি তাঁর এক বৈকালিক ভ্রমণের অতি সাধারণ ঘটনার কথা বলছেন

আমি আর শয়তান
সেদিন সন্ধ্যে বেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে
বেহেশতের দেয়ালের ওপর চড়ে বসে
চেয়েছিলাম এক দৃষ্টিতে
বেহেশতের পানে।
দেখি,
শুভ্র দুধের একটা শীর্ণা ঝর্না বইছে
মৃদু বাতাসের সাথে তাল রেখে।
তার পাশে—মস্ত বড় একটা
হজমী-গাছের নিচে
বিশাল একটা হালুয়ার ঢিপির ওপর বসে
এক মৌলানা
(দাড়ি তার বাতাসে
দুলছে),—
ঝিমুচ্ছেন।

কবিতাটার নাম দিয়েছেন : 'বেহেশতে উঁকি'।

দুই

বোধ হয় বছর দুই আগে যখন মেহদে আলী খাঁ সবেমাত্র এই ধরনের অদ্ভুত কবিতা দু-একটা করে রচনা করতে শুরু করেছেন তখন তাঁরও সন্দেহ হয়েছিল, সত্যিই কি সমালোচকরা তার কবিতাকে সহ্য করবেন ?

ভয়ে ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে একটা ছদ্মনাম নিলেন, 'মুসাফের'। কোনো রকমে সাহস করে 'গুণ্ডা' নামে একটা কবিতা পাঠিয়ে দিলেন উর্দু আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম মাসিক 'আদবে দুনিয়া'র কাছে।

খ্যাতনামা সমালোচক-কবি 'মীরাজী' তখন সম্পাদক। সাহিত্যক্ষেত্রে পাকা জহুরি বলে এঁর নাম আছে। উদীয়মান তরুণ লেখকদের মাঝ থেকে প্রতিভাবান শিল্পীদের খুঁজে বের করাই এর প্রধান বিশেষত্ব। তাঁর লেখার মাঝ দিয়ে সম্পাদনার সাহায্যে এই তরুণদেরই তিনি দিতেন সবচেয়ে বেশি উৎসাহ। মেহদে আলীর কবিতাটা সাগ্রহে 'মীরাজী' লুফে নিলেন। কবিতাটা প্রকাশ হলে ভয়ংকর হুলস্থুল সৃষ্টি করে।

দিনমজুরের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাওয়া যায় এই 'গুণ্ডা'য় :

আরে আরে ইয়ার
চেহারাটাকে বাগিয়ে ধরে
দেখ না চেয়ে একবার।
আসছে কে ঐ রাস্তা ধরে ?
সেই নারী, ল্যাংরা শেঠের সেই সুন্দরী
আসতো-যে রোজ এ রাস্তা ধরে
দিনে দুবার।
আবে ইয়ার, ফেলে দে আজ তাস!...
একবার চেয়ে দেখ
তার কালো আঁখির চঞ্চলতা। ...
তার শাড়ির বাহার।...

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রকাশভঙ্গিতে সুরুচির পরিচয় কোথা ? কিন্তু আমরা বলি, রুচিই কি সব ? প্রকাশভঙ্গীই কাব্যের সব কিছু ? কিন্তু বাস্তবতাকে কী করে অস্বীকার করা চলে ? বস্তুত মনে হয়, কবির বলবার এই বিশেষ ভঙ্গিই শুধু এই কবিতাটাকে দিয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ। না-রঙ-দেয়া কাঁচা ছবিটা ঐ ভাষার জোরেই নানা রঙের নিখুত সমাবেশে চোখের সামনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে চায়। আমরা যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, গ্যাসপোস্টের স্বল্পান্ধকারে গুটি চার-পাঁচেক কুলীশ্রেণীর লোক নগ্ন দেহে নোংরা ধূতি জড়িয়ে অর্ধ-উরু উলঙ্গ করে তামসা খেলছিল। ছিন্ন মলিন তাস সজোরে ভেঁজে কুঁজো হয়ে যেই একাগ্র মনে খেলতে যাবে, ঠিক তেমনি সময় একটু দূরে দেখা দিল একটি নিঃসঙ্গ সুন্দরী তন্বী। সেই নিস্তব্ধ মুহূর্তে সৌন্দর্য দর্শনে যে বিচিত্র অনুভূতি এই মজুর শ্রেণীর লোকদের মনেও মোচড় দিয়ে উঠেছিল, সেই বিক্ষুব্ধ শব্দতরঙ্গে তা মুখর হয়ে উঠল একজনের কথার ভেতর দিয়ে, অন্য সবার মুখ আবেগ নিস্তরঙ্গ আঁধারে যেন মূর্ত হয়ে উঠল প্রতিটি অক্ষরে। মেহদে আলী খাঁ শুধু আমার কবি নন, আপনার কবি নন, মেহদে আলী খাঁ রুদ্র ন্যায়ের জ্যোতি, কুৎসিত বাস্তবের নগ্নরূপ, প্রগতিশীল যুগের গতি।

তিন

কয়েক বছর থেকে কেন জানি তিনি আর কিছু লিখছেন না। দিল্লি রেডিও স্টেশনে থাকেন। মাঝে মাঝে জ্ঞানপূর্ণ প্রবন্ধে উর্দু সাহিত্যের সমালোচনামূলক আলোচনা করেন।

নয়া দিল্লির 'কফি হাউসে'র হল ঘরটার উত্তর কোণে বড় মতো একটা গোল টেবিল আছে। ওপরটা সবুজ কাঁচের। রোজ বিকেলে ছ-টা থেকে রাত ন-টা অবধি জোর একটা আসর বসে ওটা ঘিরে। যে কোনোদিন ঐ সাতটার মধ্যে এখানে গিয়ে উঠলে দেখবেন হয়ত ওরই একটা চেয়ারে বসে বেশ স্বাস্থ্যবান নাতিদীর্ঘ গোলগাল চেহারার গৌরবর্ণের এক ভদ্রলোক বসে। টেবিলের অন্য লোকদের সাথে মাঝে মাঝে কথা বলছেন বিনম্র আড়ষ্ট স্বরে। উনিই রাজা মেহদে আলী খাঁ। ওর পাশেই হয়ত রয়েছেন কবি আখতার-উল-ইমান, ওধারে কফি খাচ্ছেন যার গদ্যকবিতা অতুলনীয় সেই রাশেদ, আর ছন্দ-শব্দ-বিন্যাসের যাদুকর উদীয়মান কবি মোখতার সিদ্দিকী, বিদ্রোহী কবি মঈউন্ হাসান জয্‌বি!

এঁরা প্রায় সবাই তরুণ। দ্রুত প্রগতিশীল আধুনিক উর্দু সাহিত্যকে এঁরাই দেবেন অনাগত দিনের উজ্জ্বল রশ্মি। মাঝে মাঝে সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক কৃষণচন্দ্র, শাহাদাৎ হোসেন মিন্টো, বেদী, আশক মেফতীহ্—উদীয়মান কথাশিল্পী মধুসূদন, হাশ্‌মি—এঁরাও আসেন।

রোজ এঁরা এই কফিহাউসে আসেন। একজোট হয়ে বলাবলি করেন, চব্বিশ ঘণ্টার সাহিত্য জগতে কতটুকু এল, কতখানি গেল। অন্তরীক্ষে নক্‌সার পর নক্‌সা সৃষ্টি হয় উর্দু সাহিত্যেব ভবিষ্যৎ অগ্রগতির কল্পনা নিয়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে Coffee House-কে উপলক্ষ করে যে অগাস্টান যুগ গড়ে উঠেছিল, এও বোধ হয় তারই আভাস। আধুনিক উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে বসলে—মাত্র পাঁচ বছর—তার চেয়ে বেশি আগে থেকে নিশ্চয়ই শুরু করা চলে না, তবু কী ঐশ্বর্যময় এর শুরু!

কাজের ফাঁকে অবসর পেলে 'মীরাজী'ও এই 'কফি হাউসে' আসেন। ঢিলে একটা পাঞ্জাবি গায়ে আস্তে আস্তে ঢোকেন। অসুস্থ দেহ আর পুরোনো বয়সটাকে একবার মনে মনে বোধ হয় ঠেলে দেন কোঁকড়া বাবড়ী চুলগুলোর সাথে, তারপর অযত্নে রক্ষিত দাড়িভরা মুখটায় একবার হাত বুলিয়ে মদিরাগ্রস্ত চোখগুলোকে সজাগ করে বসে পড়েন ঐ তরুণদের দলে। দু'একটা মাত্র কথা বলেন, তীক্ষ্ণ চোখে এদিক ওদিক কী দেখেন, মনে হয় যেন কিছু খুঁজছেন—কী যেন বলছেন, হয়তো আগামী দিনের কোনো নতুন আর বৈচিত্র্যের সন্ধানে তিনি উন্মুখ হয়ে ওঠেন।

"যেখানে মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ জাগিয়াছে, সেখানে মানুষ বিষয়বস্তুকে গভীর নিকটে না আনিয়াও তাহাকে ভোগ করিতে পারে। ফুলের সৌন্দর্য ভোগ করিবার জন্য ফুলকে গাছ হইতে ছিঁড়িয়া আনিবার কোনো প্রয়োজন কবি অনুভব করে না।"

—ক্লাইভ বেল

সতেরো শতাব্দীর 'হেয়কেয়ি' কবিতা

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ কল্পনারশ্মি জাপানি কবিতার ওপর তখনও পূর্ণ-আভা বিস্তার করে। কবিয়া 'টাঙ্কা' কবিতায় প্রভাব থেকে নিজেদের তখনও সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে উঠতে পারেন নি। ওদিকে যান্ত্রিক-সভ্যতার ভবিষ্যৎ ঝঙ্কার শুরু হয়ে গেছে। চিত্রশিল্প বাহুল্যবর্জিত অলঙ্কারহীন চিত্রকেই রুচির সর্বোচ্চ আদর্শ বলে সমালোচকেরা মেনে নিতে আরম্ভ করেছে। সময়সাপেক্ষ, সংক্ষিপ্ত ভাব প্রকাশই মানুষের সৌন্দর্য-জ্ঞানকে বেশি আকর্ষণ করতে লাগল। একত্রিশ সিলেবেলে লেখা 'টাঙ্কা' কবিতাকে আরো ছোট আকার দেবার জন্যে দু'একজন মতামতও প্রকাশ করলেন। কিন্তু অনুভূতির সামঞ্জস্য রেখে অভিব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পূর্ণ-অঙ্গ দেবার তাগিদে তেমন কেউ সাড়া দিল না এবং সেই চললো সতেরো শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

সত্যি বলতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি থেকেই ষোল সিলেবেল-এর প্রথম সুন্দর কবিতা রচনা আরম্ভ হয়। ভাব প্রকাশের এই নতুন নামই 'হেয়কেয়ি' কবিতা। একটা সম্পূর্ণ কবিতা বলছি :

মন বর্ষার মাঝেও জেগে ওঠে,
মধ্য রাত্রির ঐ চাঁদ!
কিন্তু ছাতাটা আগে খুলে নাও।

—ইয়ামাৎসিসোকাঁ [১৪৪৫-১৫৩৪]

কবির বক্তব্য এই যে, চাঁদটা বৃষ্টি মধ্যেও উঠতে পারে কিন্তু ওর রূপে বিভোর হয়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সৌন্দর্য পান করলেই চলবে না, কারণ সেটা অস্বাস্থ্যকর। তাই মনে করে ছাতাটাও খুলতে হবে। সন্দেহ নেই যে কল্পনার রেখা দুটো হাস্যকরভাবে বিপরীতমুখো। কিন্তু সাথে সাথে এও অস্বীকার করা চলে না যে, সূক্ষ্ম বুদ্ধি-সম্পন্ন রুচির সঙ্গে বাস্তবতার সমন্বয় আশ্চর্যভাবে প্রাণ পেয়েছে।

খেয়ালি কল্পনার এমনিতর সুরের রেশ আরাকিভা মরিটেকের হেয়কেয়িতেও অনুরণিত হয়ে উঠেছে :

আমি ভাবলাম বুঝি ঝরাফুল সে,
ফিরে যায় সে তাদেরি শাখে ;
চেয়ে দেখি—সে যে প্রজাপতি

[১৪৭২-১৫৪৯]

কল্পনায় কোমল, প্রাণে স্পন্দিত। এর হাস্যরস ফরাসি চিত্রকলা। পৌরাণিক ব্যঙ্গচিত্রের মতো নয়,—এ যেন সারদাবাবুর সূক্ষ্ম সীমারেখার অন্তরালে অবনী ঠাকুরের অদ্ভুত কল্পনার বিচিত্র সংমিশ্রণ। এর বিষাদের রূপ পাড়হীন শুভ্র শাড়ি পরা অলঙ্কারশূন্য নিষ্কলঙ্ক বিধবাব প্রতিমূর্তি।

মাটসুনাগা টেইটোকু চাঁদ দেখে বলেছেন :

সবার তরেই
এ শুধু দিবানিদ্রার বীজ
শরতের এই চাঁদ।

[১৫৬২-১৬৪৫]

এখানে অবশ্য কবির রূপমুগ্ধ শিশুমন পৃথিবীর সকল মানুষকেই নিজের অনুপাতে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তার মতে শরৎ-এর ঐ চাঁদটা দেখতে দেখতে আমরা এত তন্ময় হয়ে থাকব যে, রাতের সাধারণ ঘুমকেও হয়ত ভুলে যাব। ফলে আমাদের সবাইকে ঘুমুতে হবে পরের দিন দিনের বেলায়। আর তাই কবি দোষ দিচ্ছেন চাঁদকে দিব্রানিদ্রার বীজ বলে। মত প্রকাশের এই স্বপ্নিল ভঙ্গি সত্যিই অপূর্ব। এ যেন প্রিয়তমার মিষ্টি বাঁকা রোষ প্রিয়তমের বিরুদ্ধে। বিলাসী মনের পরিচয় দিলেও কবিতার কথা বাস্তবতার সম্পর্ক হতে আলাদা হয়নি।

এমনিভাবে শ্লথ গতিতে 'হেয়কেয়ি' কবিতার চর্চা কখনো জ্বলে ওঠে, কখনো নিভুনিভু হয়ে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে চলে আসছিল প্রায় সম্পূর্ণ দেড় শতাব্দী অবধি। পাঠকেরা কিন্তু তখনও হেয়-কবিতার প্রশংসা করতে মোটেও রাজি নয়। এমন কি কাগজে একরকম খবরও ব্যঙ্গ-সুরে বেরুতে লাগল যে, কোনো অখ্যাতনামা কবি মাতাল হয়ে রাত্রিবেলা রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এক রাতের মধ্যে দু'হাজার হেয়কেয়ি নাকি রচনা করে ফেলেছেন! সতেরো শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এই ধরনের কবিতার ভিত্তি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। সমালোচক থেকে পাঠক পর্যন্ত সবাই তখন আস্থা হারিয়ে ফেলেছে হেয়কেয়ি কবিতার ভবিষ্যতের ওপর। এমনি সময়ে জন্ম নিলেন মাট্‌সুরা ব্যাৎশা। এই একেলা ব্যাৎশার দানেই সমস্ত হেয়কেয়ি-কবিতা আজ ধনী। সমস্ত জাপানি কবিতা-সাহিত্য ব্যাৎশার সদ্ভাবে নতুন পূর্ণত্ব লাভ করল। সমালোচকদের স্বীকার করতে হলো হেয়কেয়ির মহত্ত্ব।

ব্যাৎশার জীবনের ঘটনাগুলো অদ্ভুত। তিনি একবাব তার শিষ্যদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন। সাহিত্য-সমাজে তখন তিনি নামজাদা কবি। তাঁর অভ্যেস ছিল পথ চলতে চলতে হঠাৎ যদি কল্পনার কোনো টুকরো উচ্ছ্বাস মনকে আপ্লুত করে তুলে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটা সেখানেই পাথরে খুদে লিখে রাখতেন, যাতে কবিতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতির নগ্নতাকে অঙ্গে ধরে গড়ে তুলতে পারে একটা পূর্ণতর ছবি। এমনি এক যাত্রাকালে এক পূর্ণিমা রাতে ব্যাৎশা এসে এক নতুন গ্রামে উঠলেন। গ্রামে উঠতেই তিনি দেখেন খোলা মাঠে প্রায় সমস্ত গাঁয়ের লোক জড় হয়ে এক জায়গায় বসে জ্যোৎস্নার আলোতে খুশি হয়ে চাঁদের স্তুতি গান করছে। প্রত্যেকেই অন্তত একটা করে হেয়কেয়ি রচনা করে চলেছে। ব্যাৎশার খুব ভাল লাগল। সবার অলক্ষ্যে তিনিও বসে বসে ওদের কবিতা শুনতে লাগলেন। হঠাৎ অনেকের নজর গিয়ে পড়ল ব্যাৎশার ওপর। তারপর বাই বলল যে, এই অচেনা নতুন লোকটাকেও হেয়কেয়ি রচনা করতে হবে। ব্যাৎশা প্রথমে আপত্তি জানালেন। কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। বললো চেনা, অচেনা, কবি, অকবি যে কেউ হও না কেন—এখানে যখন তুমি উপস্থিত আছ, তখন তোমাকেও কিছু-না-কিছু রচনা করতে হবে। নিরুপায় হয়ে ব্যাৎশা শেষে আরম্ভ করলেন :

সে ছিল নতুন চাঁদ—

এতটা বলতেই সবাই হেসে উঠল। বলতে লাগল, লোকটা বলে কি, পাগল নাকি ? আরে এটা হলো পূর্ণিমার চাঁদ আর ও বলছে কিনা নতুন চাঁদ! সবাই চুপ করলে ব্যাৎশা বলতে লাগলেন :

সে ছিল নতুন চাঁদ,
সেই থেকে আমি পথ চেয়ে;
তুমি চোখ তোল আজ রাতে।
(আমার পুরস্কার পেয়েছি আমি।)

সবাই শুনতে লাগল একটার পর একটা হেয়কেয়ি, ব্যাৎশার মুখ থেকে—জাপানি সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। শেষ হলে পরে সবাই ধরল যে তিনি নিশ্চয় কোনো সাধারণ লোক নন। তাঁকে তাঁর পরিচয় দিতে হবে। নাম শুনে সবাই চমকে উঠল। ব্যাৎশা! তাদের গ্রামে! বিরাট সম্বর্ধনা করে সবাই মিলে তাঁকে আদর আপ্যায়ন জানাল।

ব্যাৎশার প্রভাবে আমেরিকান-কবি Fzra Pound-এর উপর যথেষ্ট পাওয়া যায়। তবে পাউন্ডের কবিতায় কখনো যৌন সংক্রান্ত, কখনো মনস্তত্ত্বের গাঢ় প্রশ্ন এসে গড়ে তুলেছে ব্যাৎশা হতে ভিন্ন আরেকটা জিনিস, কোমলতার চেয়ে আড়ষ্টতা এসে ভীড় করেছে বেশি। উর্দু-কবি মেহদে আলী খাঁও চেষ্টা করেছেন কিন্তু আধুনিকতার প্রকোপে পড়ে রূপপূজা ছেড়ে সেটা ঝুঁকে পড়েছে satire-এর প্রতি। মাঝে কবিতার আঙ্গিক রূপ প্রায় পূর্ণ হলেও ভাবের দিক থেকে সেটা হেয়কেয়ির আসল রূপ প্রকাশ করে নি।

ব্যাৎশার কবিতা 'more to sketches' শব্দের চেয়ে শব্দের পরিবর্তী কালের আবেষ্টনী দিয়ে তৈরি ছবি তৃপ্তি দেয় আরো। শুনবার সময় কানেতে যতটা মধুর মনে হয়, তার চেয়ে বড় উৎসব জাগে মনের পর্দায়।

কবি নো-শহরের মাঝখান দিয়ে চলছিলেন। সে সময় ছিল বসন্ত। চেরি ফুলের থোকায় সমস্ত শহরটা ঢাকা। ফুলের রূপ কবিকে তুলেছে পাগল করে। এমনি সময় দূরে মন্দির থেকে ঘণ্টা বেজে উঠল। কবি গেয়ে উঠলেন :

'এক মেঘ থোকা ফুল।
কোথায় বাজল ঘণ্টা
—যুনো না আসাকুসায় ?

ঘণ্টা শুনে কবি চমকে উঠলেন, কিন্তু ফুলের জন্যে বুঝতে পারলেন না, দেখতে পারলেন না যে, ঘণ্টা বিখ্যাত কোন মন্দির দুটোর একটা হতে বেজে উঠল।

আচমক পড়লে খাপছাড়া মনে হবে। কিন্তু মিলিয়ে দেখলে লোভ হয়। মনে হয় প্রকৃতির কোনো বিশিষ্ট রূপ থেকে এক টুকরো দৃশ্য যেন চুরি করে রেখে দিয়েছে অনন্তকালের জন্যে।

কুঞ্জ থেকে ভেসে এল কুহু রব,
চোখ তুলে দেখি—কোথায় দুঃখ!
এ যে শুধু পূর্ণ শশী!

ক্লান্তিহীন বিষাদের সরীসৃপ গতি ফুটে উঠেছে প্রতিটা ছোট শব্দে। মন্দগামী দুঃখ যেন রয়ে রয়ে ঝরছে।

ব্যাৎশার কবিমন কখনও ঝলমলিয়ে উঠেছে—পৃথিবী ডাকছে—ফেনায়িত খুশীর উপচে ওঠা উত্তেজনায়—

এইই কোকিল—
কান পেতে শোনো—
যত দেবতাই তুমি হও না কেন !

ব্যাৎশার পরবর্তী হেয়কেয়ি-কবিদের মধ্যে মহিলা-কবি 'শিও' ছাড়া আর কারুর নামই তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। শিওর কবিতার ভঙ্গিটা অভিনব। আর কবির নারীজাতিগত কোমলতাবশত স্বভাবতই তাঁর কবিতায় এসেছে এক উষ্ণ মাদকতা। জাপানি-কবিদের মধ্যে হেয়কেয়ির চর্চা এখন আর নেই বললেই চলে। তবে ব্যাৎশার অমর দান চিরদিন জাপানি কবিতাকে মহিমান্বিত করে রাখবে। আজও ব্যাৎশার প্রভাব থেকে জাপানি-কবিরা সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

কামাল চৌধুরীর কবিতা

সস্তা-সস্তা-সস্তা!

অচেতন মনের ওপর ইতস্তত ছড়ানো বিক্ষিপ্ত কতকগুলো ঘটনা-টুকরোকে পাঁচফোড়ন-দেওয়া নিরামিষ তরকারির মতো অপটু হস্তে জোর করে ধরে দুর্বোধ্য শব্দের মার প্যাঁচে সাজিয়ে দেওয়াটাই যদি আধুনিক কবিতার মূলমন্ত্র মনে করেন, তাহলে আমি বলব : কামাল চৌধুরী ভুল বুঝেছেন। আমারই একজন খালাম্মা একদিন বলেছিলেন, "দেখ্ যদি সুন্দর কোনো জিনিসের রূপ প্রাণভরে উপলব্ধি করতে চাস—বিশেষ করে যে জিনিসের প্রশংসা তুই অনেক দিন ধরে শুনে আসছিস—তাকে তুই দেখবি চোখ বন্ধ করে। তাতেই পূর্ণ তৃপ্তি পাবি।" কামাল চৌধুরীর কবিতা পড়ে কেন অকারণেই যেন আমার সে কথাটা মনে পড়ল। মনে হল, পুরুষ না হয়ে যদি সেই [কবির ?] নিকটগত কোনো আত্মীয়া হতাম, আর কবিতা পড়ার সময়ে অর্থ বা ভাবের দুয়োরে অর্গল দিয়ে শুধু যদি পড়েই যেতাম, তবে বোধ হয় কিছুটা তৃপ্তি পেলেও পেতে পারতাম।

ওঁব প্রায় সবগুলো কবিতাব মধ্যেই যে জিনিসটা সবচেয়ে সুন্দর তা হচ্ছে শব্দ বা বহু শব্দের সংমিশ্রণ করে কোনো অভিব্যক্তির প্রকাশ। এটুক যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে বোধ হয় কবিতার ভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মৌলিকতায় সৌন্দর্যহীনতা ছাড়া আর কিছুরই উপস্থিতি নেই। তবে দুঃখ এই যে, প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলোও আবার সম্পূর্ণ নিজস্ব জিনিস নয়—কখনো জেনে শুনে বিদেশী কবির লেখা থেকে অনুবাদ কিম্বা বেশির ভাগ সময়ে দেশী কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিক অসাধু লেখকের প্রভাবের ফল। প্রথম দোষটা ঠিক অতটা মারাত্মক নয়, যতটা ঐ দ্বিতীয় দোষটা এসে সস্তা করে দেয় সমস্ত কবিতাটাকে।

ঐ কবিতাটাকে প্রথম লাইন থেকে নেওয়া যাক। আরম্ভে আছে—

> শীতের কাঁচুলী শেষে পড়িয়াছে খসি :
> উটের পায়ের ধ্বনি
> বিদ বিক্ষত

মাঝের লাইনে হঠাৎ উটের উল্লেখ করে শীতের কোনো বাস্তব রূপকে তিনি পাঠকের সামনে উলঙ্গ করতে চাইছেন তা আমি চোখ খুলেও বুঝতে অক্ষম। দুবার আম্‌তা করে, তিনবার হাত কচলে, আমার মনে হয়, যেন এরপর Hcl কিম্বা ফানগাস্ অথবা দ্রাঘিমা রেখার উল্লেখ করলেও চলত। আর কিছু না হোক কবির নির্জ্ঞান মনের অন্তত একটা প্রকৃত ছাপ তো পাওয়া যেত। শীতের সাথে কাঁচুলী শব্দের প্রয়োগ লাইনটাকে মন্দ-নয় করে তুলেছিল। কিন্তু সাথে সাথে আরেকটা কথা কবি আমাদের বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে এই যে, কিছুদিন আগে প্রেমেন মিত্র বোধ হয় 'বেদেনী' বলে কবিতায় কাঁচুলী শব্দ একটা আধুনিক রুচিসঙ্গত স্থানে ব্যবহার করাতে কবিতাটাকে নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'তে বেশ আলোচনা চলেছিল এবং তারপরেই সখের প্রায় অনেকগুলো ব্যক্তিত্বহীন কবিই শব্দটাকে বিনি পয়সার

বাতাসার মতো স্থান-অস্থানে বসিয়ে এসেছেন যেমন করে সর্পিল আর ধূসর শব্দের বংশোদ্ধার করা হয়েছে। যাক সে কথা—এখানে কাঁচুলী শব্দের ব্যবহার সুন্দর হয়েছে।

এরপর আছে :

ফাল্গুনের মদির রাত্রে বর্ণে সমারোহ
অনাগত দিবসের নূপুর-নিক্কন

বিশুদ্ধ দুটো লাইন—আধুনিকতার গন্ধ-বিবর্জিত পরিষ্কার মনের কিছুটা অংশ। কিন্তু তার প্রকাশের কৌশল মরচে ধরা—হ্যাকনিড। বাঙালি কবির স্বভাবগত নাকে-কান্না কোমলতার কিছুটা ছন্দহীন ক্ষীণ চিৎকার। আচমকা হঠাৎ তারপর কবি অস্পষ্ট মনের ধূসর অবস্থা থেকে ছিটকে পড়ে উল্লেখ করে বসলেন রেশমী শাড়ির প্রান্তঘটিত একটা কিছু। অর্থাৎ আমাদের হয়ত এখানেও বুঝতেও হবে কোনো নারী বা দেবীর আগমনকে এবং যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গের আবির্ভাব করালেন তাই কোলাহল টেনে আনা নিতান্ত আবশ্যক। লিখলেন :

মুহূর্তের কোলাহলে মরুভূ মুখর
মেয়ে আর মদিরার স্বপ্নভরা ঠোঁটে :

নিজের মনটাকে বোধ হয় মরুভূ বলা হয়েছে। তাহলে প্রথম দিকের উটের উল্লেখটায় কিছু একটা সংগতি এখন হল বোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় লাইন কার সঙ্গে যাচ্ছে কবির ? হতেও পারে। কিংবা পথ চলতে চলতে এ কবিতারই অন্য কোথাও আর কাবো সাথে সম্পর্ক খুঁজে পেলেও পেতে পারি।

অজগর দৃষ্টিতে কাঁপে হরিণী-নয়ন আপনারা সবাই হাত তুলুন। কবির আত্মার উন্নতির জন্যে একবার প্রার্থনা করে নিই। দেখবেন ভুল করেও যেন এর মঝে লৈঙ্গিক তুলনা করে অর্থ টেনে বের করবেন না। শুধু শুধু মনটাকে নোংরা করা স্বাস্থ্য-আইন বিরুদ্ধ।

এরপর থেকে কবি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছেন। আমরা নির্বুদ্ধিমান কি আর বুঝব সম্বুদ্ধের অন্তর্জ্ঞানদৃষ্টি : বোধ হয় আকাশের দিকে মুখ তুলে চোখ বন্ধ করেই তিনি দেখলেন—

আকাশের ওষ্ঠ চুম্বি কারাভাঁ চলিছে! আমি এখানে জোর করে অকবির মতো বলছি না যে, এ ছত্রের সঙ্গে কবিতার এ পর্যন্ত লেখার সাথে নিশ্চয় একটা সম্বন্ধ থাকবে। তবে এতটুকু শুধু বলছি যে, কারাভাঁ শব্দটা হয়তো বা কবি নতুন শুনেছেন। তাঁর অচেতন মনের ওপর শব্দটা চন্‌মন্ করছিল ঠিক শোনার পর থেকেই। আর তাও শব্দটা হস্তান্তরিত হয়ে এখানে তৃতীয় হস্ত। এই উগ্র আধুনিক হওয়ার ফেনাময় ইচ্ছেটাই কবিকে উঠতে দিচ্ছে না দ্বিতীয় শ্রেণীর ওপরে। এই যে যখন-তখন যার-তার প্রভাবে উথলে ওঠা সেটাই তো মাঝে মাঝে কবিকে করে দিচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর। ব্যক্তিত্বকে তীক্ষ্ণ করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কামাল চৌধুরী যেখানে আধুনিক নতুন কোনো ভঙ্গিতে ভাব প্রকাশ করেছেন সেগুলো প্রশংসার যোগ্য। তবে তার সংখ্যা অল্প। তাই যা দুঃখ।

শব্দ-গন্ধে পাহাড়ের বুকে
ময়ূর পাখায় ঝরে রামধনু কাশ—

ধরিতে পারে না তবু
মদনভস্মের বহ্নি শিশুদের চোখে।

শুধু এই লাইন কটাই সমস্ত কবিতার মধ্যে চলনসই বলে উতরে যায়। বারবার পড়লে উষ্ণ পয়োধর নিম্নে শিশুর ছোট হাতের আকাঙ্ক্ষা তারই পাশে কবির নিজ শিশুমনের পূর্ণ কামনার প্রকাশ সুন্দর সমন্বয় রেখে চলেছে। কিন্তু এর পরের ছত্র ক-টাই একেবারে বক্ষ চিরে সমস্ত সৌন্দর্যে রূপ দিতে পেরেছে। রেজিস্ট্রার মার্কা ছাপ-দেওয়া কামাল চৌধুরী সবগুলো কবিতার কমন ফ্যাক্টর :

প্রাচীনা পৃথিবীর ঘোরে
কুমোরের চাকার মতো ঘোরে আর ঘোরে

পৃথিবীর সেই বারবার করে বলা বিশেষণ। 'হাসে আর হাসে', 'আসবে, আসবে, আসবে'— এমনিধারা দুবার তিনবার করে একই শব্দ লিখলেই কবিতার কোমলতা যে বাড়ে, এই ভুল পুরাতন ধারণাটা এসে সমস্ত কবিতার আধুনিক রুচির ভঙ্গিকে ধ্বংস করে মনের মাঝে তেতো ধরিয়ে গেল। পৃথিবীর এমন গুণ আর কাজের পরিচয় কামাল চৌধুরীর কবিতার আরেকটি সাংকেতিক চিহ্ন। বিজ্ঞাপনের মতো হাঁ করে আছে ওঁর অনেকগুলো কবিতার মধ্যে।

উটের মুখের ফেনায় মৃত্যুর ছায়া কাঁপে
ফিন্‌কক্ষের হাসির মতো—
জন্ম-মৃত্যু; স্বর্ণ-প্রেম ; এক-বহু আর

এ তিনটে লাইনে শুধু শব্দের বিকট সংযুক্তি ছাড়া অর্থযুক্ত কোনো ভাব ছেঁকে বের করা সম্ভবপব নয়। আর সে চেষ্টাই নিষ্ফল আক্রোশে উলঙ্গ করে তুলেছে প্রথম লাইনে কিছুটা কদর্য অর্থ। দ্বিতীয় লাইনে হুবহু নকল অন্য কারো লেখা থেকে। তৃতীয় লাইন পুরাতন মৃত যুগের বাজারে ফ্যাশনে গড়া—বিকৃত করে তুলেছে কবিতার এ-যুগের আবহাওয়াকে।

এবপর যে চার-পাঁচটা লাইন লেখা হয়েছে তা কুৎসিত। 'পৃথিবীর তপ্ত লৌহ' আর 'মখমল স্রোতে'র তুলনামূলক ব্যবহারে কবির ক্লেদাক্ত অনুভূতির কিছুটা বিষাক্ত অংশ শব্দ আর প্রতিধ্বনির অন্তরালে লুকোনো। সেই অকথ্য বিবমিষা ভাবটাকে জড়িয়ে দুর্বোধ্য করা হয়েছে খামোখা টেনে-আনা কতকগুলো স্থান অনুপযোগী অর্থহীন শব্দ বসিয়ে। এঁরই আরেকটা যৌন সংক্রান্ত কবিতায় ছিল 'সাগরের বুকে চিড় দিয়ে' এমনি একটা কিছু। ভাবটা বাদ দিয়ে সাগর আর চিড় শব্দ দুটো মনের পেছনে রাখুন।

কারাভাঁর পদধ্বনি চাঁদের পাহাড়ে :
বালুকা পাহাড় হয় গুঁড়ো
উটেরা হোঁচট খায় কভু।
কারাভার শ্বেত অস্থি চিড় ধরে ওঠে।

মেনে নিলুম যে উটটাকে হোঁচট খাইয়ে তিনি কিছুটা আধুনিকতার মশলা যুগিয়েছেন। কিন্তু বাকিটা ? অর্থহীন। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। দুর্বোধ্য। পুরোনো সুর বারে বারে। কল্পনায় একটুখানি নতুনত্ব থাকা উচিত, তা না হলে শুধু কয়েক হাজার কবিতা লিখলেই বড় কবি হওয়া যায় না। এর পরের লাইন কটাতেও 'অরণ্য' শব্দের ব্যবহার, 'ফাল্গুন রাত্রি' ইত্যাদিতে কামাল চৌধুরীর কবিতা কী সুন্দর রূপ জাগিয়ে তোলে তা অন্তত এর আগের আরো গোটা পঞ্চাশেক কবিতার মাঝে প্রমাণ পেয়েছি। এতটা বেহায়াপনার প্রয়োজন ছিল না।

শেষ স্ট্যাঞ্জাতেই অমিল দেওয়া কবিতা লেখার টেকনিকে তিনি যে বিরাট ছিদ্রের পরিচয় দিলেন তা সত্যিই হাস্যকর। এখানে একটা অবান্তর কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। আজিজ ওমর বলে আমার এক বন্ধু আছে। ও তবলা বাজাতে জানে না, তবু তবলা দেখলেই ও খুশি হয়ে ওঠে, আঙুল ঠুকে বাজাতে আরম্ভ করে। যদি জিজ্ঞেস করি যে কী তাল বাজাচ্ছিস রে? উত্তর দেয় গম্ভীর হয়ে, 'মিশ্র সুর; দেখ এই এখন বাজাচ্ছি খাম্বাজ, এখন দাদরা ইত্যাদি।'

এই কবিতাটার ছন্দগতিও ঠিক তেমনি। কোন সময়ে রোমান্টিক হতে গিয়ে গালফোলা শব্দ প্রয়োগে মদিরাভাব [মদিরভাব?] সঞ্চার করবার চেষ্টা করেছেন, আবার কখনো বা হঠাৎ আধুনিক হবার উদ্ভট খেয়ালে উটটাকে দিলেন হোঁচট খাইয়ে। আর তাছাড়া আগাগোড়া একটা ছেঁড়া ভাবের খাপচাড়া আবেষ্টনীতে কবি নিজের কথাগুলোকে তুলনা দিয়ে জড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। নিজেকে দুর্বোধ্য বলে প্রচার করার কী আস্ফালন!

শেষ মুহূর্তে পেঁয়াজের গন্ধের মতো উগ্র সস্তা মনোভাব এসে আপ্লুত করে ফেলেন কবিকে। 'হে' বলে সম্বোধন করে একটা কিছু বিশালতার আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন। তাতেও সেই- একই ধরনের একই অর্থে ব্যবহৃত শব্দের সুরহীন প্রলাপ—পেতলে বাঁধানো বেতের ছড়ির মতো সব কবিতায় শেষের এমনি ধারা একটা কিছু কয়েক লাইনের সৃষ্টি কামাল চৌধুরীর কবিতায় আমরা আগেও আরো এত দেখেছি। তবে তার এমন সস্তা উচ্ছ্বাস এখানেই চরমভাবে প্রাণলাভ করেছে।

হে সমুদ্র রাজকন্যা
আনো বন্যা
নীল রক্তস্রোতে
চোখে আনো মৃত্যুর উল্লাস
আকাশের ওষ্ঠ চুম্বি চলিছে কারাভাঁ
জীবনের কোথা অবকাশ?

আন্ডার লাইন করা শব্দগুলো ওঁর কবিতার আরো কতকগুলো বাঁধাধরা গৎ। আর এগুলোই করে তুলেছে ওঁর কবিতাকে—cheap!

নাট্যসাহিত্য

কোনো রকম ভূমিকা না করে সরাসরি বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করা যাক। বিশেষ করে আমার বক্তব্যের সাদামাটা ও মোটা কথাটা কারো কাছেই যখন আর আজ অস্পষ্ট নয়, তখন গোড়াতেই হরেক রকম কঠিন ও জটিল তত্ত্বের অবতারণা করা নিতান্তই অর্থহীন হবে। যে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে নাট্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত প্রথমে সেই পরিস্থিতির একটা পর্যালোচনা করা যাক। অবস্থার কথা বলতে গেলে সমস্যার কথাও এসে পড়বে। এবং একবার অবস্থা ও সমস্যার স্বরূপ সম্বন্ধে যদি আমাদের সকলের চেতনা সতেজ এবং সজাগ হয়ে ওঠে তা হলে তার শুভ প্রভাব সৃষ্টির বৃহত্তর ক্ষেত্রেও চিহ্ন রেখে যাবে।

১৯৫১ সাল থেকে আমাদের এখানে নাটকের জন্য প্রকৃত হৈচৈ শুরু হয়েছে। সেই হৈচৈ মাঝে মাঝে মন্দীভূত হয়ে এলেও কখনো একেবারে থেমে যায় নি। একটানা চলে এসেছে, ছড়িয়ে পড়েছে। রাজধানী শহরের উন্মাদনা স্পর্শ করেছে গোটা পূর্ববাংলাকে। এ-শহর ও-শহরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে ন্যাটানুষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য, মঞ্চে সজ্জার জাঁকজমকে। এককালের হিন্দুপ্রধান এই সমস্ত শহরে পূজা পার্বণ উৎসবের মৌসুম নাটকে সেরকম সরগরম থাকত, আজকে আবার তারই নতুন জোয়ার সকল রকম প্রতিকূলতার কালো যবনিকা ভেদ করে কলকল করে এগিয়ে আসছে। যে কোনো উছিলায় নাটক করার জন্য উৎসাহী ছেলে-মেয়ে, ছাত্র-মাস্টার, চাকুরে-বেকার, কেরানি-গৃহস্থে দেশটা একেবারে ভরে গেছে। আগে নাট্যামোদী মঞ্চপ্রিয় অভিনয়াভিলাষী ব্যক্তিবর্গের হয়ত খুব অভাব ছিল না। কিন্তু এখন স্কুলে-কলেজে, অফিসে-পাড়ায় এমন সব গোষ্ঠীর সন্ধান পাই যাদের একমাত্র বিশেষণ হলো নাটক-পাগল। তারও পর নাটক করার পেশা আর সাধারণ নাগরিকের দেখবার পেশা সমানে পাল্লা দিয়ে চালায়—একেবারে সোনায় সোহাগা হয়েছে। যে কোনো উপলক্ষে নাটক করার জন্য আজকাল রীতিমতো হুড়োহুড়ি লেগে যায়।

কিন্তু এই হৈ-হল্লার একটা উল্টো পিঠ আছে। সেখানে নাটক করার জন্য যে পরিমাণ হৈচৈ, নাটক না পাওয়ার জন্য অবিকল সেই পরিমাণ হাহাকার বিরাজমান। নৈরাশ্যজড়িত কণ্ঠে নাট্যরস-পিপাসী সেখানে মঞ্চোৎসাহীকে বলছে—নাটক! নাটক! যেদিকে তাকাই কেবলই নাটক, কিন্তু সে নাটক আমাকে নাড়াতে পারে, পোড়াতে পারে, বাড়াতে পারে—সে নাটক কোথায়! সে নাটক কী! এখনও আসে নি! তার কি আসার সময় হয় নি ? কবে আসবে ? কোন পথে আসবে ?

বাস্তব অবস্থায় একেবারে কেন্দ্রস্থলে এই দ্বন্দ্বটি কী জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে! ভাঙছেও না, হিলছেও না। আমার প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য এই দ্বন্দ্বের মর্ম বিশ্লেষণ করা, এর অস্তিত্ব ও সারবত্তার ইতিহাসগত কারণ অনুসন্ধান করা—সর্বাঙ্গীণভাবে এই দ্বন্দ্বস্থলে মূল্য বিচার করা। আতঙ্কিত হবেন না। দীর্ঘ রচনা দ্বারা আপনাদের বিরত করার মতো অনাটকীয় মনোবৃত্তি আমার নেই। গোটা আলোচনা সংক্ষেপে ও ইশারায় সম্পন্ন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব। সে সাহিত্যের কোনো প্রতিষ্ঠিত সুস্পষ্ট ঐতিহ্য নেই সঙ্কটকালে তার অবস্থা কিঞ্চিৎ

অনিশ্চিত ও করুণ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কিন্তু যে বাঙলা সাহিত্যের একটা উনবিংশ শতাব্দী ছিল, সে বাঙলা সাহিত্যের কোনো শাখা দ্বিখণ্ডিত ও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়বে, সঙ্কট জর্জর অবস্থায় হতাশ ও দিশাহারা হয়ে পড়বে, এমন কথা নিজে জেনে নিতে রাজি হবো না। আমাদের দেশে যাঁরা নাটক নিয়ে অহোরাত্র মেতে থাকেন, ঘরে-বাইরে তাদের বদনামের অন্ত নেই। নাট্যামোদীরা সে জাতীয় বদনামের বড় বেশি পরোয়া কোনো দিনই করে নি। কিন্তু যে বদনামটা সচরাচর প্রকাশ্যত কেউ ঘাটাঘাটি করতে চায় না, শেষটায় নিজেদের ঘাড়ে এসে পড়ে—নাকি সেই ভয়ে সেই অগৌরবের কথা জোর গলায় প্রচার করার দরকার হয়ে পড়েছে। মঞ্চের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মুখে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, নাট্যসাহিত্যে আমাদের দারিদ্র্য অপরিসীম। অতীতেও এই শাখায় আমরা আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারি নি, বর্তমানেও আমরা সেই বন্ধ্যা ঐতিহ্যের জের টেনে চলেছি মাত্র এবং বাঙালির সাহিত্যে, মানসিকতায় এবং জীবনে সর্বত্রই নাটকীয় উপাদানের বিকট অভাব। এই বাঙলা বিভক্ত হওয়ার অভাব আরও উৎকটরূপ ধারণ করেছে মাত্র। কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি যখন এ জাতীয় উক্তি করেন তখন আমারও সন্দেহ হয় হয়ত তিনি অনেক মৌলিক গবেষণা করে থাকবেন এবং তাঁর বিশিষ্ট চিন্তাধারায় সত্য এই আকারেই ধরা দিয়েছে। আর বাদবাকি যাঁরা এ জাতের ঢালা সাফাই গান তাঁদের বিরুদ্ধে আমার ঘোরতর অভিযোগ করেছে। তাঁরা বাঙলা সাহিত্যের স্বকীয় ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে চান নি, জানতে চান নি, বুঝতে চান নি। অপরিচয়ের আদিগত বহুরকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে রেখেছে অসার শিশুসুলভ থিওরি দিয়ে।

বাঙলা সাহিত্য বেশ প্রবীণ ও পরিণত। তার আধুনিক সাহিত্যও প্রৌঢ়—দেড় শত বৎসরের সাধনায় পরিপুষ্ট। এই আধুনিক সাহিত্যের সোনালি ফসল ফলেছে উনবিংশ শতাব্দীতে। সেই উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান বাঙলা নাটক। এবং বিস্ময়কর রকম অল্প সময়ের মধ্যে মোটামুটিভাবে পঞ্চাশ বৎসর বাঙলা নাটক তাঁর শৈশব-কৈশোর অতিক্রম করে সরস সবল প্রৌঢ়তা লাভ করেছে। অনুপ্রেরণা এসেছিল বিদেশ থেকে, কিন্তু তার রূপায়ণ ঘটেছে দেশজ জীবন ও কল্পনার আঁচ লেগে। মাইকেল-দীনবন্ধু-গিরিশ-অমৃতলাল বাঙালি নাট্যকার, পরিচিত পৃথিবীর দৃশ্যকাব্য রচয়িতা, এ দেশের প্রকৃতি কাব্য-শিল্প ঐতিহ্যের ধারক। আজকের আমাদের মতো সে যুগও ছিল এক বিশেষ অর্থে বিশেষ জাতীয় জাগরণের যুগ। যেহেতু নাটক দৃশ্যকাব্য, সাহিত্যের যাবতীয় রূপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ জীবনের স্বাভাবিকতম রূপায়ণের উপর নির্ভরশীল। সেহেতু নাটকের সার্থকতা ব্যাপকতম প্রচার ও অনেকের ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা (একাধিকের) ভিন্ন প্রকাশ লাভ করে না। সেই হেতু সার্থক নাটক মাত্রেই যুগে যুগে সমাজজীবনের কেন্দ্রস্থ ধারাপ্রবাহ থেকে রস-পুষ্টি আহরণ করে থাকে। নাটকে রামনারায়ণ তর্করত্ন বিত্তশালী সমাজসেবীর আহ্বানে বল্লাল সেনীয় কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে নাটক রচনা করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা বিবাহ নাটক বারবার দেখতে আসতেন এবং শেষ দৃশ্যে সন্তানসম্ভবা নিরপরাধ বিধবা রমণী সুলোচনার আত্মহত্যা দেখে কোনবারই অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। মাইকেলের প্রহসনে নবীন বঙ্গ, প্রবীণ বঙ্গ উভয়ের যে নগ্ন দৃশ্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার বক্তব্যের ক্ষুরধার শ্লেষ আজও নাটকীয়তায় তীক্ষ্ণ ও প্রচণ্ড। নীলদর্পণের নাট্যকার দীনবন্ধু যে প্রহসনে কি নিপুণ সমাজ সচেতনতা মঞ্চানুভূতি ও নাটকীয় রস সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তার পূর্ণ স্থান আজ আমাদের মনের মধ্য থেকে অপসৃত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিহাস নিয়ে নাটক লিখতে গিয়ে দেশাত্মবোধের আগুনে তাকে আগে পুড়ে নিয়েছেন, আর, সে

আগুন যখন নিবল তখন মর্মান্তিক আবেগের টানা-পোড়েনে বিক্ষুব্ধ, স্তব্ধ ক্ষতবিক্ষত চরিত্রগুলো সব চিরন্তন মানুষের রূপান্তরিত হয়ে মঞ্চ থেকে উঠে এসে বুকে এসে বাসা বাঁধে। উপেন্দ্রনাথের ভয়ঙ্কর নাটক দেখে ইংরেজ সরকার এত বিচলিত হয়ে উঠেছিল যে, ১৮৭৭-এ তাকে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করতে হয়েছিল। এরপরই ঊনবিংশ শতাব্দীর একবারে শেষ প্রান্তে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আবির্ভূত হলেন গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল, ডি এল রায় ; ক্ষীরোদ প্রসাদ সুস্থ জীবনবোধ ও বিচিত্র সৃষ্টি প্রয়াসে; পরিণত নাট্যকৌশল ও সার্থক মঞ্চ পরিবেশনায় ; ধাবাল এবং গাঢ় সংলাপে, জটিল ও জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টিতে ঊনবংশ শতাব্দীর বাঙলা নাটক আশ্চর্য ঐশ্বর্য সম্পদ সম্পন্ন। এমন ঐতিহ্য কি ব্যর্থ যাবে ? ভাল নাটকের অভাবে আমরা যখন বিজ্ঞের মতো শেষ অভিমত প্রকাশ করে হতাশার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি তখন একবার কি আমাদের পুরাতন বিচিত্র নাট্যাবলীর পুনরাভিনয়ের কথা মনে পড়তে পারে না ? মাইকেলে 'বুড়ো শালিকে ঘাড়ে রো', দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি নাট্যসমূহ যে তাদের আবেদনের তীব্রতা আজও বিন্দুমাত্র হারায় নি, তা আমি সুযোগ পেলে প্রমাণ করব বলে দৃঢ় সংকল্প করেছি। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই যে আমরা সর্বাগ্রে আমাদের সমাজ নিয়ে আমাদের পরিচিত দুনিয়ার নাটক চাই। কিন্তু যতদিন বা যখনই তার অভাব ঘটছে তখন অর্থহীন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের বিকৃত রুচির দুর্বল নাটক মঞ্চে স্থান দেয়ার কী তাৎপর্য থাকতে পারে ? লাভের মধ্যে এই হতে পারে যে পূর্ববাঙলার সুস্থ জাগ্রত নাট্যপিপাসু নাগরিকের চোখ-কানকে স্থূল উত্তেজনাপূর্ণ রস পরিবেশন করে এমন বিকৃত করে দেব সে কিছুকাল পর Sensational drama ছাড়া অন্য কোনরকম স্থূল ও শুভ আবেদনের তার চিত্ত সাড়া দিতে ভুলে যাবে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে প্রত্যেক নাট্যাভিনয়েব জন্য পূর্ববঙ্গে আজ বিপুল দর্শক শ্রেণী আগ্রহে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে ভিড় করে অপেক্ষা করে।

তাঁদের বেশির ভাগের অকৃত্রিম কৌতূহল ও আনন্দ পানের সরল চেতনা প্রায় সব নাটকেই করতালি দিয়ে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। সুস্থ আনন্দ পরিবেশনের দায়িত্বও সেই কারণে সমপরিমাণে আমাদের জন্য আজ বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে সর্বসাধারণের শিল্পচেতনাকে উন্নত করে সার্থক নাটক সৃষ্টির পথকে সুগম করে দেয়ার দায়িত্বও আমাদের তৈরি করে নিতে হবে। জীবনরস পুষ্ট, শিল্পকৌশল মণ্ডিত, সমাজের মর্মকোষ থেকে উদ্ভূত নাটকের সঙ্গে নাট্যকার দর্শক ও অভিনেতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ ভিন্ন আমাদের নাট্যজগতের অগ্রগতির ভিন্ন পথ নেই। আমাদের বাঙলা নাটক এই গৌরবময় ঐতিহ্যের খনি—অজ্ঞতা ও অন্ধতার জন্য আমরা যদি তাকে অবজ্ঞা-অবহেলা করে থাকি তবে তার পরিণাম আমাদের জন্য অভিশাপপূর্ণ হতে বাধ্য। আজকাল সাধারণত আমরা যে স্তরের নাটক মঞ্চে পরিবেশন করে থাকি, দুটো জাতে তাকে ভাগ করা চলে। এক, পেশাদার রঙ্গমঞ্চের স্থূল আবেদনের অর্থহীন, অশ্লীল, উদ্ভট নাটক—যার মধ্যে কোনরকম জীবনের কোনরকম সত্যভাষণেরই কোনো চিহ্ন নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে আমাদের সমাজ সম্পর্কিত আমাদের কারো লেখা নাটক। এ পথই ঠিক পথ, এই এরাদাই শুভ। কিন্তু এখনও এর শিশুকাল। প্লটের মধ্যে অনুকরণপ্রিয়তা ও অস্বাভাবিকতা দূর হয়নি। ঘটনার চয়নে ও গঠনপ্রণালীতে যেখানে সুস্থ মৌলিকতার ছাপ রয়েছে সেখানেও যান্ত্রিক জ্যামিতিক সরলতা। নাট্যকাহিনীকে বিচিত্র রহস্যময় জীবনকাহিনীতে রূপান্তরিত হতে দেয় নি। চরিত্রগুলো ঘোরতর রকমভাবে এক মাত্রিক ; গাঢ়তা নেই, গভীরতা নেই, জটিলতা নেই। সার্থক নাটকে কঠিন শৃঙ্খলের মধ্যে

সহজ সাবলীল ঘটনাবলীর অন্তরালে প্রতি স্তরে বিভিন্ন চরিত্রের চেতনায়-সত্তায় ফল্গুধারার মতো যে জীবনবোধ বারবার উথলে ওঠে উপচে পড়ে, ঘূর্ণীত আলোড়িত তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে তার চিহ্ন আমাদের নাটকে এখনও জুটে ওঠে নি। নীলদর্পণের তোরাপ, সধবার একাদশীর নিমে দত্ত, বুড়ো শালিকের ভক্ত প্রসাদ, অমৃতলালের মাস্টার সিং (বিবাহ বিভ্রাট), কিম্বা লোভী পুরোহিত (কৃপণের ধন) যখন কথা বলে তখন সে সংলাপ যে কেবল বারবৈদগ্ধ্যের দিক থেকে চিত্তহারী হয় তা নয়। তার অন্তরালে সংঘাতপূর্ণ মানবমনের যে হৃদ্‌স্পন্দন আমাদের চোখের সামনে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে তার গৌরবেই সে সংলাপ প্রকৃত নাটকীয় গুণ ভূষিত, দৃশ্যকাব্য রস সিঞ্চিত।

উপসংহারে আমার বক্তব্যের সার আরেকবার জানিয়ে নিচ্ছি। শিল্প-সাহিত্যের দ্বন্দ্ব বা সঙ্কট নিরসনের প্রকৃষ্ট পথ সে সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে। সেই ঐতিহ্যের মূলধারার সঙ্গে পরিবর্তনশীল জীবন ও পরিবেশের শিল্পসম্মত পরিপূর্ণ মিলন ব্যতীত সার্থক সৃষ্টি সহজসাধ্য হয় না। নিজের সাহিত্যের ইতিহাসের ধারার সঙ্গে পরিচয়, তার প্রচার ও উপলব্ধি আজ বাঙলা নাট্যসাহিত্যের পুনর্জাগরণের জন্যও অপরিহার্য। সৌভাগ্যের কথা এই যে, আমাদের ঐতিহ্য দরিদ্র নয়, দুর্বল নয়, সঙ্কীর্ণ নয়। বাঙলা নাটকের স্বর্ণযুগ উনবিংশ শতাব্দী। বিগত যুগের ঐশ্বর্যের এই পুঁজি সম্বল করে অগ্রসর হতে পারা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। এরপরও যখন আমরা নাটক নেই বলে আক্ষেপ করি তখন সত্যই নিজের মানসিক দৈন্যের রূপকে প্রকট করে তুলি। রামনারায়ণ, মাইকেল, দীনবন্ধু, মনমোহন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণের পর গিরীশ ঘোষেব অভ্যুদয়। তিনি একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "দায়ে পড়ে out of sheer necessity যখন মাইকেল-বঙ্কিম প্রায় Dramatized করা শেষ হলো, স্টেজে আর কোনো অভিনয়োপযোগী নাটক মিলল না তখন বাধ্য হয়ে নাটক রচনা করতে হলো।" আমরা গিরীশ ঘোষ না হয়ে এবং আরম্ভ না করেই যে অভাবের অভিযোগ আজ তুলছি তা কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ ও করুণ।

আর যাঁরা হতাশ হয়ে বলেন নাটক লিখব কী করে, জীবনে নাটক কোথায়, তাঁদের সঙ্গেও আমি একমত নই। ১৯৫৮ সালে ছাত্রদের ওপর লাঠি চালনা থেকে শুরু করে বাহান্ন সালেব গুলি চালনা পর্যন্ত নাটকীয় উপাদান জীবনের কোথাও কি দানা বেঁধে ওঠে নি? ৫২/৫৩ সালের কোনো এক হাটে এক বোঝা পাটের দাম মাত্র দু'আনা শুনে যে চাষী এক চুল পাটও বিক্রি না করে সবটাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল সে কি কাউকে নাটকীয় কাহিনীর কোনো সন্ধান দিয়ে যায় নি? ৫৩/৫৪ তে খবরের কাগজেই নাটকের ছড়াছড়ি কম ছিল না। এক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইশারা বহন করে মাসখানেক আগে যে ভোটাভুটি হয়ে গেল তার মধ্যে নাটকীয় রঙ্গরস ক্রন্দন হাহাকার কিছুই ধ্বনিত হয়ে ওঠেনি? জীবনের আরো বাঁকাচোরা গোপন পথে, ব্যক্তিজীবনের রহস্যময় হৃদয়কন্দরে, পরিবারে, হস্টেলে, জেলখানায়, রাস্তায়, কলেজে-ফ্যাক্টরিতে, ক্ষেতে-খামারে নাটক অহরহ পাকা ধানের ছড়ার মতো গুচ্ছে গুচ্ছে দুলছে, আমরা চোখ বুজে আছি তাই দেখছি না। যেখানে মানুষ আছে, মন আছে, দেহ আছে, সমাজ আছে, সেখানেই নাটক আছে। আমাদের পশ্চাতে আছে বিপুল বিচিত্র ঐতিহ্য, চারিপাশে নবজীবনের মর্মরিত জলোচ্ছ্বাস, সামনে স্বপ্নমুখর কল্পনার হাতছানি— আমাদের নাট্যসাহিত্য ব্যর্থ হবে না।

শেক্সপীয়ার

আমাদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মে গেছে যে শিল্পী সমাজের আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক মানুষ নয়। সে বিচরণ করে কল্পনার জগতে, আর আমরা মাটির পৃথিবীতে ; এবং সেই কারণেই আমরা ধরে নেই যে প্রতিভাবান যে কোনো শিল্পীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালীও হবে উদ্ভট ও দুর্বোধ্য। এমন কি সাংসারিক বুদ্ধিতে অতিমাত্রায় পরিণত ও ধর্মীয় গোঁড়ামিতে অতিমাত্রায় অন্ধ ব্যক্তিরা পৃথিবীর সর্বত্রই যুগে যুগে একথাও প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, শিল্পীর নীতিবোধ সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর, কবির উপলব্ধ সত্য ধর্মীয় স্বার্থের বিরোধী। এই ধরনের চিন্তাধারা যে কত ভ্রান্তিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন, ইংরেজি-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্সপীয়ারের জীবন ও নাটক তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

গুণীলোককে জীবিত অবস্থায় সম্মান দেখাতে মানুষের একটা স্বাভাবিক কার্পণ্য আছে। এর কারণ অবশ্য যতটা নয় ইচ্ছাকৃত, তার চেয়ে অনেক বেশি তার স্বভাবজাত অক্ষমতা। অতি নিকট আত্মীয়ের অসাধারণ গুণাবলি সম্পর্কে আমরা যেমন স্বভাবতই অচেতন থাকি, ঠিক তেমনি সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীর প্রতিভাকেও সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে আমরা সব সময় সমর্থ হই না। একটি যুগের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে যে সাহিত্যিক সর্বযুগের সত্যকে নিজস্ব মৌলিক ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে চায়, সর্বান্তঃকরণ দিয়ে তাকে সহজে গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই বেঁচে থাকতে প্রতিভার ভাগ্যে জোটে শ্রদ্ধার বদলে অপমান, পুরস্কারের বদলে লাঞ্ছনা, উপাসকের বদলে নিন্দকের বাহিনী।

শেক্সপীয়ারকে অবশ্য এতখানি অপমানিত, নির্যাতিত জীবন কাটাতে হয়নি। কৈশোরোত্তীর্ণ হবার আগেই গ্রাম ছেড়ে শেক্সপীয়ার শহরে আসেন অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে। লন্ডন শহরের এক নাট্যশালায় শেক্সপীয়ার সেদিন চাকরি নিয়েছিলেন আর্থিক অনটন থেকে বাঁচবার পথ হিসেবে। স্বল্প বেতনের সে চাকরি খুব যে সম্মানজনক ছিল তাও নয়। তাঁর কাজ ছিল মঞ্চের পরিচর্যা করা, দৃশ্যসজ্জায় টুকিটাকি সাহায্য করা, আর অভিনয়ের সময় নেপথ্যে নিচু স্বরে নাটকের পাণ্ডুলিপি থেকে বিভিন্ন অভিনেতার পার্ট পড়ে দেওয়া। মাঝে মাঝে ছোটখাট পার্টও তাঁর ভাগ্যে জুটত।

সেযুগে নাটক শুধু অভিনীত হতো, ছাপা হতো না। নাট্যকারেরা উপযুক্ত পারিশ্রমিকের পরিবর্তে বিশেষ কোনো নাট্যালয়ের কাছে বেচে ফেলতেন তাঁদের পাণ্ডুলিপি। উপরি আয়ের পথ খুঁজতে খুঁজতে শেক্সপীয়ার একদিন আবিষ্কার করেন যে, আদর্শ নাটকের সংলাপ রচনা করাও তাঁর পক্ষে এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। নাট্য-মঞ্চের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে, শেক্সপীয়ারের মঞ্চানুভূতি তখন হয়ে উঠেছে পরিণত, সংলাপের কান হয়ে পড়েছে অতি সজাগ। মঞ্চের উপর কোন দৃশ্য কখন সব চাইতে বেশি উত্তেজনাপূর্ণ ও শক্তিশালী হবে, সে সম্পর্কে শেক্সপীয়ারের চেতনা তখন ত্রুটিহীন। বেশ মোটা মজুরির পরিবর্তে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেক্সপীয়ার ভার পেলেন, বিভিন্ন নাট্যকারের পাণ্ডুলিপির সংস্কার ও সংশোধন করবার।

শিল্পচর্চা যে লাভজনক অর্থকরী ব্যবসাও বটে, এ উপলব্ধি কিন্তু শেক্সপীয়ারের রুচি ও কল্পনাকে কোনোদিন বিকৃত করে তুলতে সমর্থ হয় নি। এ দরিদ্র নাট্যকারের আর্থিক সচ্ছলতার প্রতি যে অদম্য কামনা ছিল, তাকে বিদ্রূপ করার মতো সাহস আজ কারো নেই। শুধু পরের নাটক সংশোধন করার বদলে তখনকার সাহিত্যরীতি অনুযায়ী শেক্সপীয়ার অন্যের সহযোগিতায় নিজেও নাটক রচনায় মনোযোগ দিতে আরম্ভ করলেন। প্রতিভার উন্মেষ এখান থেকেই শুরু। কিছুদিন পর লন্ডন শহরের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যকার হিসেবে চতুর্দিক থেকে প্রশংসা পেতে লাগলেন শেক্সপীয়ার। তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের মতো। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে শেক্সপীয়ার সৃষ্টি করে চললেন একটার পর একটা নতুন নাটক। স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড গ্রামের চালচুলোহীন সেদিনের কিশোর আজ লন্ডনের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের একজন। এখন তিনি সে নাটক লেখেন শুধু অর্থের তাগিদে নয়, সৃষ্টি করেন শিল্পীর রসানুভূতিকে চরিতার্থ করবার জন্যও। মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়সে হঠাৎ শেক্সপীয়ার ঠিক করলেন, রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করে অবসর গ্রহণ করবেন। সৃষ্টির বিরামহীন ব্যস্ততা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন শেক্সপীয়ার। স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড গ্রামের প্রকৃতি হাতছানি দিয়ে ডাকল শিল্পীকে। শেক্সপীয়ার ফিরে গেলেন গ্রামের অতি আদরের কন্যার সঙ্গে জীবনের শেষ ক'টা বছর কাটাবেন বলে। আরো তিন বছর পর স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড গ্রামে ২৩ এপ্রিল (১৬১৬) শেক্সপীয়ার মৃত্যুবরণ করেন।

শেক্সপীয়ার তাঁর যুগে বহুলভাবে আদৃত হলেও, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব তখনও সম্যকরূপে স্বীকৃত হয়নি। একটা অত্যন্ত ছোট অথচ লক্ষ করবার মতো ঘটনা থেকে শেক্সপীয়ারের প্রতি তাঁর সমসাময়িক যুগের শ্রদ্ধার স্বরূপটা আমরা আঁচ করতে পারি। এলিজাবেথান কাব্যের একটা লক্ষণ হচ্ছে তার বিষাদময় মৃত্যু-কামনার সুর। মরণানুভূতিকে গৌরবমণ্ডিত করে কাব্যে রূপান্তরিত করা ছিল বেশির ভাগ কবিরই একটা বৈশিষ্ট্য। সে যুগের যে-কোনো স্বল্পপরিচিত শিল্পী কিংবা রুচিবান ধনী লর্ডের মৃত্যুই কাব্যরচনার জন্য কবিদের একটা বিশেষ অনুপ্রেরণা দিত। অথচ শেক্সপীয়ারের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে এক ছত্র অশ্রুমিশ্রিত করুণ কাব্য রচিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। অনেকের মধ্যে একজন সার্থক নাট্যকার—শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে সেযুগের বেশির ভাগ সমালোচক এর চেয়ে বেশি কোনো উচ্চ ধারণা পোষণ করত না। এমনকি শেক্সপীয়ারের মৃত্যুর একশ' বছর পর পর্যন্ত তাঁর জীবনী রচনায় উৎসাহী কোনো সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় নি। তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে সত্যিকারের প্রচেষ্টা যখন থেকে শুরু হলো তখন শেক্সপীয়ারের জীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য দুঃখজনকভাবে সীমাবদ্ধ। আজও আমরা তাঁর জীবন সম্পর্কে যেটুকু সুনিশ্চিত বলে জানি, তার সীমানা মাত্র পাঁচটি তারিখের বিচ্ছিন্ন সংখ্যার মধ্যে পর্যবসিত। এক জানি তাঁর জন্ম তারিখ, আর জানি যে উনিশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়, তাঁর চেয়ে সাত বছরের বড় এক তরুণীর সাথে। তাঁর প্রথম কন্যা ও দু'টি যমজ সন্তানের জন্ম তারিখ ও তাঁর মৃত্যু দিবস ছাড়া ইতিহাস শেক্সপীয়ারের জীবনের উপর অন্য কোনো আলোকপাত করে না। আজ সাড়ে তিনশ' বছর পর, আমাদের পুস্তকাগারে অসীম পরিশ্রমশীল পণ্ডিতদের কল্যাণে হয়তো কিছু বা বিপুলাকৃতির শেক্সপীয়ার-জীবনী আশ্রয় লাভ করেছে। যে জীবন সেখানে বর্ণিত হয়েছে তাতে সত্যের অপলাপ হয়তো করা হয় নি, কিন্তু কল্পনার সহায়তা নেওয়া হয়েছে পুরোপুরি। সত্যিকারের ঘটনার চেয়ে সেখানে স্থান পেয়েছে সম্ভাব্য কাহিনী। এ জাতীয় জীবনীগ্রন্থ গবেষণামূলক নয়, কল্পনামূলক। এতে অবশ্য হতাশ হবার কিছু নেই;

শেক্সপীয়ারের জীবনী সম্পর্কে এ অজ্ঞতা শেক্সপীয়ারকে উপলব্ধির পথে এমন কিছু অনতিক্রমনীয় প্রতিবন্ধক নয়। কারণ শিল্পীর সত্যিকারের পরিচয় তার সৃষ্টিতে, জীবনীতে নয়।

শেক্সপীয়ারের নাটক পড়তে গিয়ে সবার আগে আমাদের যা স্তম্ভিত করে দেয়, তা হচ্ছে, তাঁর চিন্তাজগতের অবিশ্বাস্য রকম বিপুল পরিধি। ছত্রিশটা নাটক তিনি রচনা করেছেন বিশ বছরের মধ্যে। এক একটা নাটক যেন এক একটা স্বতন্ত্র পৃথিবী। হাসি-কান্নায় মেশানো আবেষ্টনী প্রতিটি নাটককে করে তুলেছে জীবনের ছন্দে স্পন্দমান। এক নাটক থেকে অন্য নাটকে প্রবেশ করে প্রতিবারেই বিস্ময় আরও বেড়ে চলে। প্রত্যেকবারেই যেন নব নব পৃথিবীর উন্মেষবৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যে প্রভাময় শেক্সপীয়ারের সৃষ্টি।

"টুয়েলফ্‌থ্ নাইট"-এর আবেষ্টনীতে আছে স্বপ্নপুরীর মায়া ; কাব্যক্ষরা প্রেম-গুঞ্জন যেন আড়াল করে রেখেছে আকাশ-পরীদের লঘু পদক্ষেপকে। অশরীরী এই স্বপ্নাচ্ছন্ন পৃথিবী আবার অকস্মাৎ "মাচ্ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং"-এ আলোড়িত হয়ে উঠেছে দুই প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্তবিভ্রান্তকারী বুদ্ধিদীপ্ত রহস্যালাপের সংঘাতে। রোমিও-জুলিয়েটের প্রথম পরিচয় যে উচ্ছল ছন্দিত কবিতার চরণের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, নিয়তির কোনো নিষ্ঠুর আঘাতই আমাদের মনে সে সুর স্তব্ধ করে দিতে পারে না। সন্তানের প্রতি স্নেহে অন্ধ, বার্ধক্যের প্রভাবে অসহিষ্ণু, মুকুটহীন হয়েও ক্ষমতা প্রয়োগে প্রচেষ্ট রাজা লিয়ার যখন রাজকীয় সিংহাসনের স্মৃতিতে তার আদরের কন্যার কল্পিত পিতৃদ্রোহিতার শোকে মুহ্যমান, তখন কেবল শেক্সপীয়ারের লেখনী তাকে বাস্তব ও জীবন্ত করে তুলতে পারে কয়েকটি সহজ শব্দের আড়ম্বরহীন সমাবেশে। প্রকৃতির প্রমত্ত ঝড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তখন গর্জন করে ওঠে লিয়ারের অভিশাপ আর অনুশোচনা ও কাতরোক্তি। সৌন্দর্যের পূজারী কল্পনাপ্রবণ উচ্চাভিলাষী ম্যাক্‌বেথের মতো আদর্শ সেনানায়কের চরিত্রের 'ট্র্যাজিক' নাটকের আদর্শ অনুভূতির আবেদন। আততায়ীর হাতে নিরপরাধ শিশুর হত্যাদৃশ্য, অসহায় বৃদ্ধ অতিথির বিশ্বাসঘাতক গৃহস্বামীর ছুরিকাঘাতে প্রাণদান, চরম বিপদ্‌গ্রস্ত নিরুপায় পতিপ্রাণা স্ত্রীর ভয়াবহ আর্তনাদ, নৃত্যরত বীভৎস প্রেত-প্রেতিনীর পদধ্বনি— সব মিলে হয়তো শুধু গভীর ভীতিই আমাদের মনে জাগিয়ে দিত, কিন্তু নাটক তাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারত না। গভীর ভীতি, সেই সঙ্গে গভীর অনুকম্পা— যে কোনো মহৎ চরিত্রের যুক্তিসঙ্গত অনিবার্য পতনের দৃশ্য দর্শনে যে অনুভূতি আমাদের মনে জাগে— এ দু'য়ের সংমিশ্রণেই জন্ম নেয় সার্থক বিয়োগান্ত নাটক।

শেক্সপীয়ারের কল্পনার শিকড় প্রবেশ করেছে জীবনের গভীর থেকে গভীরতম স্তরে। তাই তো তাঁর নাটক পড়ে আমরা এত যুগ পরেও এত সহজে, এত গভীরভাবে মুগ্ধ হই। তাঁর নাটকের পৃথিবী আমাদেরই বৃহত্তর অস্তিত্বের অংশ। শেক্সপীয়ারের নাটকের চরিত্র যেন আমাদের মতোই রক্তমাংশের পূর্ণাঙ্গ জীব ; আলাদা আলাদা ধমনীপুষ্ট স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ওদের প্রত্যেকেরই আছে। তাই তিনশ' বছরের মধ্যে কাগজের মৃত কালো অক্ষরের বন্ধন ছিন্ন করে ওরা সব সার বেঁধে দুনিয়ার সত্যিকারের মানুষের ইতিহাসে দখল করে বসেছে স্থায়ী আসন। মেদবহুল ফলস্টাফ, মিথ্যাবাদী ফলস্টাফ, কাপুরুষ ফল্‌স্টাফ, ব্যাধিগ্রস্ত, পানাসক্ত, দুশ্চরিত্র ফলস্টাফ— তবু অতি প্রিয়, অতি কাম্য, অতি অন্তরঙ্গ। ফলস্টাফ কেবল শেক্সপীয়ারের নাটকের একটা কল্পিত চরিত্র নয় আমাদের কাছে সে একজন রীতিমতো

মানুষ। যে ঔষধ-বিক্রেতা একবার মাত্র সমস্ত নাটকের মধ্যে পদক্ষেপ করল, রোমিওর কাছে বিষ বিক্রি করার সময় উচ্চারণ করবার সুযোগ পেল কয়েকটা অক্ষর মাত্র, সেও আমাদের কল্পনায় তার অস্তিত্বের ছাপ রেখে গেছে সুস্পষ্ট সীমারেখায়। যাদু আছে শেক্সপীয়ারের শব্দে—কয়েকটা অক্ষরের সমষ্টি তাই অত অল্প পরিসরের মধ্যেও সৃষ্টি করতে পারে একটা বিশেষ দেহের, বিশেষ মনের, বিশেষ ব্যক্তিত্বের মানুষকে। শেক্সপীয়ার-সৃষ্ট বিরাট সংখ্যক চরিত্রের বাস্তবতায়, সততায়, বৈচিত্র্যে, বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে ফরাসি ঔপন্যাসিক ডুমা একটা খুব মূল্যবান কথা হালকা কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। তিনি বলেছিলেন, সৃষ্টিকর্তার পর শেক্সপীয়ারই নাকি পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ সৃষ্টি করে গেছেন।

শেক্সপীয়ারের নাটকে স্থিতিশীল জড় চরিত্রের কোনো স্থান নেই। নাটকের কৌশলপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের সাথে সংগতি রেখে চরিত্র যদি ক্রমবিকাশের পথে পূর্ণত্ব লাভ না করে, তবে সে চরিত্র হয়ে দাঁড়ায় মৃত, অবাস্তব। পাঠকের মনে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদনের পরিবর্তে সে সৃষ্টি করে ক্লান্তি ও অনাস্থা। ইতিহাসের পাতায় যে চরিত্রের স্বাক্ষর আছে, শেক্সপীয়ারের ঐতিহাসিক নাটকে সে-ও নতুন করে জন্ম নেয়, বাঁচতে শুরু করে বাড়তে থাকে একেবারে নাটকের শেষ পরিণতির দৃশ্য অবধি। ক্রমে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় সে। কিন্তু, তাই বলে কখনও স্ববিরোধী গুণ অর্জন কিংবা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তির রূপ ধারণ করে না। চরিত্রসৃষ্টিতে শেক্সপীয়ারের কৃতিত্ব এইখানেই যে অন্য নাট্যকারেরা যেখানে ঐতিহাসিক চরিত্রকে পর্যন্ত যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য সততার সঙ্গে বর্ণনা করতে সমর্থ হন নি, শেক্সপীয়ার সে স্থলে নিছক রূপকথার কাহিনীকেও দান করেছেন বলিষ্ঠ বাস্তব পৃথিবীর শক্তি।

কবিতার কবিতায় আর নাটকের কবিতায় বড় রকম একটা পার্থক্য আছে। ঠিক যেমন খুব মার্জিত ও অলঙ্কৃত ভাষায় লেখা কথোপকথন মাত্রেই আদর্শ সংলাপ বলে বিবেচিত হয় না, তেমনি সে সংলাপ কবিতায় গীতময় হয়ে উঠলেই তাকে নাটকীয় মর্যাদা দেওয়া চলে না। শেক্সপীয়ারের সংলাপ হচ্ছে নাটকে আদর্শ কবিতার নিদর্শন; এই কবিতার শব্দচয়নে ব্যাকরণ কী ছন্দের কঠিন নিয়মাবলিকে সব সময়ে অনুসরণ করা চলে না। এর প্রধান দায়িত্ব নাটকীয় মুহূর্তটিকে দর্শকের মনে তীব্রভাবে তড়িৎবেগে প্রতিফলিত করা। কখনও অসম্পূর্ণ ব্যাকরণবিরোধী দু'লাইন অসংলগ্ন উক্তি কিংবা অত্যন্ত কর্কশ ছন্দহীন একই শব্দের কয়েকবার পুনরাবৃত্তিও শেক্সপীয়ারের রচনায় বহু নাটকের চরম-মুহূর্তকে করে তুলেছে আলোকোজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী।

কোনো নাটক রসোত্তীর্ণ হলো কিনা তা নির্ভর করে সে নাটকের মঞ্চোত্তীর্ণ হবার ক্ষমতার উপর। অবশ্য আদর্শ নাটক রঙ্গমঞ্চে যেমন সাফল্য লাভ করবে, পাঠককেও তেমনি আনন্দ দান করবে। কিন্তু, নাটক পড়বার সময় যদি আমরা প্রতিমুহূর্তে তাকে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত অবস্থায় কল্পনা না করতে পারি, তবে তার বাঞ্ছিত রস হতে বহু পরিমাণে বঞ্চিত হব। শেক্সপীয়ারের নাটকের রস পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাই প্রয়োজন আমাদের মঞ্চানুভূতিকে পরিণত করে তোলা। এই অনুভূতিকে জাগ্রত করে তোলবার পথে অপরিহার্য একটি সোপান হচ্ছে মঞ্চের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতর পরিচয়। যতদিন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে আমাদের প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নিবিড় না হবে, ততদিন অবধি বাংলায়

নাট্যসাহিত্যেরও উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হবে না।

আমাদের সমাজজীবনে রঙ্গমঞ্চ আজও খুব গর্হিত স্থান না হলেও অপ্রয়োজনীয় বিলাসের স্থান বলে নিশ্চয়ই পরিগণিত ও অবহেলিত। ধর্মপ্রাণ মুরব্বিদের সামনে রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক উৎসাহ প্রকাশ করতে আমরা আজও সাহস পাই নে। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নাটকের জন্ম ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। অথচ নাটকের পূর্ণ বিকাশের পথে বারবার আঘাত হেনেছে গির্জার প্রতিনিধিরাই। মঞ্চ ও গির্জাব দ্বন্দ্ব ইংরেজি-সাহিত্যের ইতিহাসে এক কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়। গির্জার জুলুমে নির্যাতিত বা রাজরোষে পতিত হয়নি এমন নাট্যকার বা নাট্যালয়ের সংখ্যা ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশি নয়।

শেক্সপীয়ারের অবশ্য এ দুর্ভোগ ভুগতে হয় নি। তার প্রধান কারণ তিনি যেমন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন, তেমনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে যুগধর্মের কাছে নতি স্বীকার করে চলবার ক্ষমতাও ছিল তাঁর অদ্ভুত। সবাই যা সহজে গ্রহণ করবে, সকলের তুষ্টির জন্য তা তিনি সব সময়েই তাঁর নাটকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের যা বিশেষ করে দেয়, তাও তিনি সবাইকে দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করিয়ে নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটক : উপলব্ধির রূপান্তর

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সহস্র বৎসর পুরাতন। এই ভাষায় রচিত সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আমার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যাঁর গল্প-নাটক, কবিতা-গান, প্রবন্ধ-উপন্যাস বাংলা ভাষার সর্বোত্তম বিকাশের ধারক ও বাহক সেই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আমার সত্তার সামগ্রিকতা ও পরিপূর্ণতা আজ কল্পনীয় নয়। আমার নিভৃততম চিন্তার গুঞ্জরণ, গভীরতম ভাবনার আলোড়ন, তীব্রতম উপলব্ধির জাগরণ সহস্র সূত্রে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুপ্রাণিত, রবীন্দ্রকাব্যের ভাষার ছন্দে স্পন্দিত, রবীন্দ্রকল্পনার আলোকে পরিপ্লাবিত।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে রবীন্দ্রকাব্যের পাঠকের শ্রেণীভেদ আছে। সে কাব্যের রসাস্বাদনের প্রবণতা দেশ কাল ও পরিবেশভেদে বিচিত্র পথে আবর্তিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালীন পাশ্চাত্য জগৎ 'গীতাঞ্জলি'র যে আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত শান্তরসে মুগ্ধ হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহু পূর্বেই রবীন্দ্রকাব্যের বিদগ্ধ বাঙালি পাঠক সে বিহ্বলতা থেকে মুক্তি লাভ করে। সমকালে রবীন্দ্রনাথেব কাব্যের চেয়ে সম্ভবত তাঁর ছোটগল্প বেশি আদৃত ও পঠিত হয়েছে, রবীন্দ্রচিত্র জীবনের যে অতৃপ্ত ও অশান্ত বিক্ষোভ প্রতিফলিত তার আবেদন নবমর্যাদা লাভ করেছে।

উনিশ 'শ সাতষট্টির পূর্ব-পাকিস্তানি পাঠক হিসেবে আমরাও রবীন্দ্রসাহিত্যের নব মূল্যায়নে ব্যাপৃত। যত কাল অতিবাহিত হচ্ছে ততই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের একাত্মবোধের কিছু বন্ধন দৃঢ়তর হচ্ছে, কিছু ছিন্নও হচ্ছে। পঞ্চাশ বৎসর ব্যবধানের দুই রবীন্দ্রভক্তের মধ্যে প্রকৃতিগত মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রবীন্দ্রদ্রোহীদের মধ্যেও। রবীন্দ্রনাথেব অশ্লীলতা আজ কারো শিরঃপীড়ার কারণ নয়, তাঁর দুর্বোধ্যতা নিয়েও কেউ চিন্তিত হয় না। বরঞ্চ সমালোচনার পাঠ্যপুস্তকে আজো তাঁর যে জীবনদেবতার উপাখ্যান, নিরুদ্দেশলোকের সৌন্দর্যারাধনা ও সসীম-অসীমের মিলনতত্ত্ব ক্লান্তিহীন উদ্যমের সঙ্গে অসংখ্যবার পুনরাবৃত্ত হয়, যুগচেতনাস্পৃষ্ট নবীন পাঠক তাকে উপেক্ষা করে না হলেও, অতিক্রম করেই রবীন্দ্রকাব্য-পিপাসা নিবৃত্ত করে।

একটা সহজ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। 'মুক্তধারা' নাকটটি। এই নাটকেব মুখ্য প্রতিনিধি ধনঞ্জয়। তিনি বিপ্লবী নন, বৈরাগী মাত্র। তাঁর মধ্যে বিদ্রোহের ভাবের চেয়ে ভক্তির প্রবণতাই বেশি। তাঁর সত্যভাষণের নির্ভীকতা কখনো কখনো ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দীপনা সঞ্চার করলেও তাঁর আসল প্রয়াস ভক্তিমার্গে জীবের মুক্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই উৎকণ্ঠা যুগধর্মের দ্যোতক নয়। সমকালীন পাঠক দর্শক শ্রোতা হয়তো 'মুক্তধারা'র মন্ত্রীর গানের চেয়ে যন্ত্রীর গানেই বেশি মুগ্ধ হবে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির আগোচরে যুগের মূল্যবোধের পালাবদল ঘটেছে, অন্তত তাঁর জীবনাবসানের কালে তো বটেই। প্রকৃতি ও যন্ত্রের মধ্যে সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্যের যে দ্বন্দ্ব 'মুক্তধারা'য় ও রবীন্দ্রকাব্যের অন্যত্র পরিকল্পিত হয়েছে তা বর্তমানে অহেতুক এবং অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হতে বাধ্য। যন্ত্রের মর্যাদা এখন সংশয়ের বস্তু নয়, যেমন নগরও আর ধিকৃত হয় না গ্রামের বিরোধী শক্তিরূপে।

উভয়ই মানবসমাজের ক্রমবিকাশের স্তর ও প্রকৃতিকে সূচিত করে মাত্র। যন্ত্রশক্তিকে বিভীষিকাময় করে তোলে মানবসমাজের এক বিশিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থবুদ্ধি, গ্রাম ও নগর উভয়ের অগ্রগতি প্রতিহত করে শ্রেণীবিশেষের একই পাপবুদ্ধি। যুগচেতনার এই মৌল পরিবর্তনের ফলে 'মুক্তধারা'য় রবীন্দ্রকল্পিত মূল্যবোধের যে সংঘাত প্রদর্শিত হয়েছে আজ তার আবেদন দুর্বল ও গুরুত্বহীন বলে প্রতীয়মান হয়। তার ওপর যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে মন্ত্রশক্তির যে মহিমা নাটকে কীর্তিত হয়েছে তার ভিত্তি মূর্তিপূজার ঐতিহ্যাশ্রয়ী হওয়ায় পূর্ব-পাকিস্তানি মুসলমান পাঠকের চিত্তে তার প্রতিষ্ঠা দুরূহতর। যা প্রশংসিত হয় তা হলো নাটকীয় সংলাপের সূক্ষ্মতা ও সরসতা, সর্বাঙ্গীণ কলারীতির বৈদগ্ধ্য ও শালীনতা এবং কোনো কোনো তত্ত্বাংশের সামাজিক ও ইহলৌকিক প্রজ্বলন্ত স্পষ্টভাষিতা।

যেমন, কঙ্কর চরিত্রের উক্তি : 'ওরে নরসিংহ, লোকটা তর্ক করে যে। দেশের পক্ষে ওর বাড়া আপদ নেই'। অথবা সেই সম্পূর্ণ কৌতুকাবহ দৃশ্যটি যেখানে উত্তরকূটের গুরুমহাশয় উচ্চারণে অপটু জ্ঞানহীন ছাত্রদের সংগঠিত করছেন বিশেষ কোনো উৎসবে মহারাজের 'জয়ধ্বনি' চিৎকারের জন্য।

(একদল ছাত্র লইয়া অদূরে গাছের তলায় উত্তরকূটের গুরুমশায় প্রবেশ করিল।)

গুরু। খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখছি। খুব গলা ছেড়ে বল, জয় রাজরাজেশ্বর।

ছাত্রগণ। জয় রাজরা—

গুরু। (হাতের কাছের দুই একটা ছেলেকে থাবড়া মারিয়া)—জেশ্বর।

ছাত্রগণ। জেশ্বর।

গুরু। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। (ঠেলা মারিয়া) পাঁচবার।

ছাত্রগণ। পাঁচবার।

গুরু। লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। বল্ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। উত্তরকূটাধিপতির জয়—

ছাত্রগণ। উত্তরকূটা—

গুরু। —ধিপতিব

ছাত্রগণ। —ধিপতির

গুরু। —জয়

ছাত্রগণ। —জয়।

রণজিৎ। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

গুরু। আমাদের যন্ত্রবাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল

হতেই গৌরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষই বাদ দিতে চাই নে।

রণজিৎ। বিভূতি কি করেছে এরা সব জানে তো ?

ছেলেরা। (লাফাইয়া হাত তালি দিয়া) জানি, শিবতারাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছে।

রণজিৎ। কেন দিয়েছে ?

ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করবার জন্যে।

রণজিৎ। কেন জব্দ করা ?

ছেলেরা। ওরা যে খারাপ লোক।

রণজিৎ। কেন খারাপ তা জান না।

গুরু। জানে বই কি মহারাজ। কিরে তোরা পড়িস নি—বইয়ে পড়িস নি—ওদের ধর্ম খুব খারাপ—

ছেলেরা। হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

গুরু। আর ওরা আমাদের মতো—কী বল না—(নাক দেখাইয়া)

ছেলেরা। নাক উঁচু নয়।

গুরু। আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কী প্রমাণ করে দিয়েছেন—নাক উঁচু না কী হয় ?

ছেলেরা। খুব বড় জাত হয়।

গুরু। তারা কী করে ? বল্ না পৃথিবীতে—বল্—তারাই সকলের উ না ?

ছেলেরা। হ্যাঁ, জয়ী হয়।

গুরু। উত্তরকূটের মানুষ কোনোদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস ?

ছেলেরা। কোনোদিনই না ?

গুরু। আমাদের পিতামহ—মহারাজ প্রাগজিৎ দু-শ তিরেনব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাত-শ দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না ?

ছেলেরা। হাঁ, দিয়েছিলেন।

গুরু। নিশ্চয়ই জানবেন মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগ্যরা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এইসব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কত বড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি এক দণ্ডও ভুলি নে। আমরাই তো মানুষ তৈরি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাঁদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কি পান আর আমরাই কি পাই তুলনা করে দেখবেন।

মন্ত্রী। কিন্তু ওই ছাত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার।

গুরু। বড়ো সুন্দর বলেছেন মন্ত্রীমশায়, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্কার। আহা, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বড়ো দুর্মূল্য—এই দেখেন না কেন, গব্যঘৃত, যেটা ছিল—

মন্ত্রী। আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যঘৃতের কথাটা চিন্তা করব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট হল।

(জয়ধ্বনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়া গুরু মশায় প্রস্থান করিল।)

এসব দৃশ্যের আবেদন দেশকালের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করে বহু দেশের বহু চিত্তকে স্পর্শ করে। কৌতুকময় তির্যক বাক্‌ভঙ্গি বক্তব্যকে এমন একটা স্থিতিস্থাপকতা দান করেছে যে তার তাৎপর্য, পরিবেশ ও কালের ব্যবধান সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ বলে অনুভূত হয়। শিল্পীর বিদ্রূপের লক্ষ্য যেমন উত্তরকূট, তেমনি উত্তরকালের সমগোত্রীয় সকল রাষ্ট্রশক্তিব কূটবুদ্ধিও বটে।

নজরুল কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ

কোনো কবির পরিচয়কে বিশেষণের দ্বারা খণ্ডিত করে বিচার করতে বসায় কিছু বিপদ আছে। কিছু সার্থকতাও আছে। বিপদ এই জায়গায় যে কবির শিল্প-সত্তা একক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, অবিভাজ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন। একটা বিশেষণের দ্বারা তাঁকে চিহ্নিত করতে গেলেই অন্য একটি বিপরীত বিশেষণ দশ দিক থেকে ছুটে এসে অনর্থ বাধিয়ে দিতে চায়। তবুও আমরা সম্পূর্ণকে বর্জন করে অংশকে বড় করে দেখাই। কবির সমগ্র প্রকাশকে নানা খণ্ডে ভাগ করে তার একেক দিক নিয়ে আলোচনা করি। এভাবে অগ্রসর হওয়ার সার্থকতা এই জায়গায় যে, কবিতার নানা স্তরের বিচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্য দিয়েই আমরা তাঁর সামগ্রিক স্বরূপকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের কবি, বিপ্লবের কবি, শান্তির কবি, সাম্যের কবি। তিনি প্রেম ও অপ্রেমের, হিংসা ও ভালোবাসার, মিলন ও সংঘাতের কবি। আস্তিকতা ও নাস্তিকতা, ধার্মিকতা ও অধার্মিকতা, ইসলাম ও অনৈসলাম সবই নজরুল-কাব্যে পাশাপাশি আবিষ্কারযোগ্য। সব কিছু মিলিয়েই নজরুল ইসলাম কবি। আমাদের বর্তমান আলোচনার বিশিষ্ট লক্ষ্য নজরুল কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ বর্ণনা করা, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা, তার মূল্য বিচার করা।

ভাব ও বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে সমগ্র নজরুল কাব্যকে দুটো প্রধান ভাগে ভাগ কবা যেতে পারে। এক শ্রেণীতে পড়বে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'ফণি মনসা', 'জিঞ্জীর', 'সন্ধ্যা' ও 'প্রলয়-শিখা'। 'দোলন চাঁপা', 'ছায়ানট', 'পুবের হাওয়া', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক' এগুলোর কাব্যধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পর্যায়ের। নিজের দেশ-জাতি-ধর্ম সম্পর্কে কবি তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভ-হতাশা, রোষ-উল্লাসকে প্রকাশ করেছেন প্রথম পর্যায়ের রচনাবলিতে। এখানে আবেগের প্রখরতার সঙ্গে মত বা বক্তব্য প্রচাবের তাগাদা প্রায় সমপরিমাণে মিশ্রিত। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যগহনে প্রেমাশ্রিত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগই সার্বভৌম। নজরুলের উত্তরকাব্য 'নতুন চাঁদ' ও 'শেষ সওগাতে' উভয় ধর্মের কবিতাই সংকলিত হয়েছে। স্বভাবতই আমাদের আলোচনার প্রধান অবলম্বন হবে প্রথম ধারার কাব্যগ্রন্থসমূহ। এগুলোর মধ্যে 'অগ্নি-বীণা'ই প্রধান। বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণে নজরুলের কৃতিত্ব এই গ্রন্থেই সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক কবিতায় সর্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বলতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'শাত-ইল আরব', 'খেয়া-পারের তরণী', 'কোরবাণী', 'মোহররম' সবই অগ্নি-বীণার কবিতা। নজরুল-কাব্যে ইসলামী অনুপ্রেরণার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা আরো একটি তৃতীয় ধারার সীমানা নির্দেশ করতে পারি যার সবটাই সরাসরি ইসলাম প্রীতিমূলক। যেমন 'কাব্যে আমপরা' (অনুবাদ), 'মরু-ভাস্কর' এবং তাঁর অজস্র ইসলামী গান। কবির ধর্মপ্রাণ সামাজিক সত্তা এই রচনাগুলোর মধ্যে আন্তরিক বিশ্বাসের প্রেরণায় বিকাশ লাভ করেছে। শিল্পমূল্য বিচারের কঠিন মানদণ্ড আরোপ করলে হয়তো এর সবটা চিরকালের জন্য উত্তীর্ণ হতে পারবে না, কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মুসলিম গণমানসের ওপর

এগুলোর প্রভাবই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং গভীব। বাঙালি মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতীয় বোধ এগুলোকে আশ্রয় করেই আত্মসচেতন হয়েছে।

'অগ্নি-বীণা'র কথায় ফিরে আসা যাক। এখানে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ উৎকৃষ্ট কাব্যমূল্যের মর্যাদা লাভ করেছে। প্রতিভার যে বিশিষ্ট চেতনা ও প্রক্রিয়ার ফলে বাংলা কাব্যে এই নতুন শক্তি সঞ্চারিত হলো তার মর্মবাণী আজও আমাদের জন্য এক গভীর তাৎপর্য বহন করে।

কাব্যের বহিরাঙ্গে নজরুলের কৃতিত্ব আরবি ফরাসি শব্দের অবাধ এবং অকুণ্ঠ সংযোজনায়। এগুলোর ভাবানুষঙ্গ মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতি বিজড়িত। তার কিছু বাঙালি মুসলমানের দৈনন্দিন ব্যবহারিক সম্পদ থেকে আহরিত, কিছু তাঁব জ্ঞানার্জিত শব্দ ভাণ্ডার থেকে চয়ন করা। কবির একমাত্র লক্ষ্য ছিল সেগুলোর প্রয়োগ যেন যথাযথ হয়, ললিত হয়, ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায় যেন পাঠকের মন কেড়ে নিতে পারে। শব্দের বিস্ময়কর ধ্বনিগত সমারোহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ-নিরপেক্ষ মোহবিস্তারে পর্যন্ত সমর্থ হয়েছে—"ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই, ছন্দ যেন ভাবেব দাসত্ব করিতেছে। কোনোখানে অধিকারের সীমানা লংঘন করে নাই— এই প্রকৃত কবিশক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দেব বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুব, শব্দবিন্যাস ও ছন্দ ঝংকারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব।

যখন পড়ি—

উবজ য়্যামেন নজদ হেজাজ তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান তিহরান স্মরি' কাহার বিরাট নাম
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম'।
চলে আঞ্জাম্
দোলে তাঞ্জাম্
খোলে হুরপরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম।
টলে কাঁখের কলসে কওসব-ভর,
হাতে আব-জম-জম-জাম্।
শোন দামাম কামান্ সামান্
নির্ঘোষি' কার নাম
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম'।

তখন প্রতি চরণের অর্থোদ্ধারের জন্য মোটেই চিন্তান্বিত হই না।" 'খেয়া-পারের তরণী' পড়ে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার অভিভূত হন। তাঁর নিজের ভাষায় "আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব,

আবুবকর ওসমান ওমর আলী হায়দার
দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।

কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা,

দাঁড়ীমুখে সারি গান— লা শরীক আল্লাহ্।

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডম্বরু-ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে—বিশেষ, এ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য "লা শরীক আল্লাহ"— যেমন মিল তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবি বাক্য যোজনা বাঙ্গালা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।"

নজরুলের ঐতিহ্য-প্রীতি সামান্য সামাজিকের অতীতের প্রতি অন্ধ মোহের সঙ্গে তুলনীয় নয়। নজরুল অতীতকে স্মরণ করেছেন বর্তমানকে পুনর্নির্মাণের হাতিয়ার রূপে। তাঁর কবি-দৃষ্টিতে ইতিহাস চিরজীবন্ত। মহর্‌রম কী কোরবাণীর কাব্য রচনা করতে গিয়ে তাঁর উদ্‌গত অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে সমকালীন মানুষের তৃষাতপ্ত জীবনের ওপর। কামালের কীর্তি ও তাঁর অনুসরণকারীদের আত্মদানের মহিমা ঘোষণা করতে গিয়ে স্বদেশের শহীদদের জন্যই তাঁর বাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—

মৃত্যু এরা জয় কবেছে, কান্না কিসেব
আব্ জম্‌জম আনলে এরা, আপনি পিয়ে কলসি বিষেব।
কে মরেছে ? কান্না কিসের ?
বেশ করেছে !
দেশ বাঁচাতে আপনারি জান্ শেষ করেছে।
বেশ করেছে !!
শহীদ ওরাই শহীদ !
বীরের মতন প্রাণ দিয়েছে, খুন ওদেরই লোহিত।
শহীদ ওরাই শহীদ !!

বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণে নজরুল ইসলাম সার্থকতা লাভের মূলে কাজ করেছে এই দুই কাব্যসূত্র। এক, নতুন হোক পুরাতন হোক, দেশী হোক বিদেশী হোক শব্দের ধ্বনিগত ব্যবহারে তিনি ছিলেন অসাধারণ কুশলী কারিগর; দুই, তাঁর ঐতিহ্যবোধ ছিল জীবন-সম্পৃক্ত। অতীতকে তিনি নকল করেননি, ঐতিহ্যকে আউড়ে যাননি, তাকে নবরূপ দান করেছেন, বর্তমানের সঙ্গে তার সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন অনাগত দিনের স্বপ্নসম্ভাবনায় তাকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছেন।

আধুনিক নাটক

আধুনিকতার ধারণা মূলত আপেক্ষিক। সমকালীন নাট্যধারায় একাধিক বিপ্লবাত্মক অভিনবত্বের প্রবর্তকরূপে ইউরিপিদিস বিস্তর নিন্দা ও স্তুতির ভাগীদার হন। পূর্ববর্তী নাটকসমূহের তুলনায় তাঁর নাটকে বাস্তবতার অনুবর্তন ছিল দুঃসাহসিকরূপে সাধারণ জীবনের অঙ্গীভূত, তাঁর সংলাপের ভাষা ছিল অতিরিক্ত অলংকরণের প্রতিষ্ঠিত কাব্যরীতির বিরোধী, তাঁর মতবাদের মধ্যে ছিল গণতন্ত্র ও মানবিকতার অনুমোদন, নারীর নিজস্ব অধিকার ও মর্যাদাবোধের স্বীকৃতি। ইউরিপিদিস ছিলেন দু'হাজার বছর পূর্বেকার গ্রিস দেশের একজন রুষ্ট তরুণ। এই অর্থে শেক্সপিয়রও তাঁর কালে নব নাটকের জন্মদাতা। নাটকের যে ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্য গ্রিস থেকে রোম, রোম থেকে প্যারিস, প্যারিস থেকে লন্ডনে তর্কাতীতভাবে পূজিত হয়ে আসছিল শেক্সপিয়র তার মর্মমূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি স্থান, কাল ও ঘটনার ত্রৈরাশিক ক্লাসিক্যাল ঐক্যবিধির অবহেলা করে নতুন রোমান্টিক নাটকেব জন্ম দিলেন। কল্পনার অবাধে ঐশ্বর্যে পরিমণ্ডিত হয়ে আদর্শায়িত মানব-মানবী রঙ্গমঞ্চের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এই প্রথম আনুভূতিক সত্তার দুর্জ্ঞেয় রহস্য অনাবৃত করার সুযোগ লাভ কবল।

বাংলা নাটকেব উন্মেষপর্বেও একপ্রকার আধুনিকতার সচেতন অনুশীলন লক্ষণীয়। দেবতাকে বিসর্জন দিয়ে মঞ্চে মানুষের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা, পুরাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য নাটকের শক্তিকে নিয়োজিত করা সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসনকে সজ্ঞানে উপক্ষো করা, যাত্রাব গীতাশ্রু মণ্ডিত ভক্তিরসের পরিবর্তে মানবীয় হৃদয়াবেগের আবর্তকে আশ্রয়, সবই ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাট্যকলার ক্ষেত্রে আধুনিকতার প্রাথমিক পদক্ষেপ। এই চেতনা ক্রমশ বিকশিত হয়ে বাংলা নাটককে বিভিন্ন প্রকার পরিণতি দান করে।

একটা কথা। বাংলা নাটকের ক্রমপরিণতি উদ্দেশ্যের সংশোধনে এবং পরীক্ষিত আঙ্গিকের পরিমর্জনায় যতটা সজাগ এবং সফল, নবনাট্যকলার উদ্ভাবনে তা সমপরিমাণে উদাসীন ও বন্ধ্যা। এক রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা বাদ দিলে বাংলা নাটকের শতাব্দীভেদ নেই, সবই উনিশ শতকী। সংলাপ গ্রন্থনে, কাহিনী নির্মাণে, চরিত্র পরিকল্পনায়, শিল্পগত উৎকর্ষ-অপকর্ষের অর্থে নয়, শুধুমাত্র রীতির বিচারে, মাইকের মধুসূদন ও নুরুল মোমেনের ব্যবধান শতাব্দীগত নয়। মৌখিক বুলির পরিভাষায় একে বড় জোর বলা যায় উনিশ-বিশ। শতবর্ষব্যাপী আমরা আমাদের নাটকীয় ভাবনার মধ্যে জীবনের মাত্র কয়েকটি সরলীকৃত ধারণা স্থান দিতে পেরেছি। সেগুলোর মঞ্চগত রূপায়ণের সাধনা একবার পরিচিত প্রণালীতে সিদ্ধিলাভের পর নতুন কোনো প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনায় মেতে ওঠেনি। মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরীশ, দ্বিজেন্দ্রলাল জ্যোতিরিন্দ্র, অমৃতলাল, রাজকৃষ্ণ, ক্ষিরোদপ্রসাদ এবং আরও পরবর্তীকালের কলিকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয় নাট্যকারও সকলেই অঙ্গে অঙ্গে এক। এরা চবিত্রে পূর্ণাবয়বতা ও গাঢ়তা আনয়নের জন্য ঘটনা যে নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বাক্য ও পদ

গঠনের যে কৌশলে ভাষাকে ঝংকৃত মন্দ্রিত করে তোলেন তার মধ্যে পুনরাবৃত্তিমূলক সাদৃশ্য সহজেই নজরে পড়ে। রূপে সকলেই সনাতনপন্থী। এসব নাটকের বাণীও সরল সমাজের সংস্কার সাধন, দেশাত্মবোধের জাগরণ বা মধ্যবিত্তের ভূস্বর্গ পরিবারের পরিবারে ভাবালুতাপূর্ণ সুনীতির উদ্বোধন। দীনবন্ধু কি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে বিশেষ করে তাদের নাটকীয় সংলাপের মধ্যে কখনও কখনও মানুষ্য জীবনের অন্তর্লোকের অনাস্বাদিত জটিলতা ও সূক্ষ্মতার ক্ষণস্পর্শ দ্যুতিময় হয়ে উঠলেও বাংলা নাটকে মাইকেলের কবিতা কি বঙ্কিমের উপন্যাসের জীবনোপলব্ধির বর্ণাঢ্য ইঙ্গিতময়তা অনুপস্থিত।

রাসিন, কর্নিল কি শেক্‌সপিয়রের আদর্শ আমাদের জন্য কোনোদিনই যথেষ্টরূপে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। আমরা কেবল বড় বড় চিন্তার আবশ্যকীয় সার সবলতম আঙ্গিককে রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করিয়ে দি— এখনও দিচ্ছি। এই ঐতিহ্যের অপূর্ণতার বিরুদ্ধে আমাদের অসন্তোষের অভাবই নবনাটক সৃজনে আমাদের প্রধানতম অন্তরায়। জীবনের ভোল বদলে গেলেও আমাদের জীবনবোধ পাল্টায় না, পাল্টালেও আমাদের শিল্পচেতনা তার উপযুক্ত আঙ্গিক উদ্ভাবনের আবশ্যকতা অনুভব করে না, সেজন্য তৎপর হয়ে ওঠে না। অথচ পাশ্চাত্য নাট্যকলার ক্রমবিকাশের প্রতি পর্বে পুরাতনের বিরুদ্ধাচরণ স্বাভাবিক ঘটনা। এই আধুনিক কালেও তার পালাবাদলের একাধিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ইবসেনে তার এক মোড়: সুসন্‌জস হৃদয়াবেগের স্বপ্নাচ্ছন্নতা থেকে আধুনিক সামাজিক সত্তার সুতীক্ষ্ণ চিন্তাব প্রশ্নময় জগতে উত্তবণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজ নাট্যকার বার্নার্ডশ এই প্রবণতাকেওই চূড়ান্ত পরিণতি দান কবেন তাঁর তর্কপ্রধান নাটকে। নির্মম বাক্যবাণে ধূলিসাৎ করে দিতে চাইলেন জগতের পূর্ববর্তী সকল নাট্যকারকে তাঁদের ধ্যান ধাবণাকে, তাঁদের কলারীতিকে। চিন্তাতাড়িত প্রখর সংলাপ বিভিন্নমুখী তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ সংঘাত সৃষ্টি করে নবনাটকের সূত্রপাত করল। সকল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানকারী, সুগ্রথিত আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত সর্বাংশে সুগঠিত নাটকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সূচনা এইখান থেকে। ইটালির পিরান্ডেলো, জার্মান ভাষার ব্রেখট, স্বকীয় জীবনবোধের উপলব্ধিকে সততার সঙ্গে ব্যক্ত করবার জন্য আরও নতুন নতুন আঙ্গিকের জন্ম দিলেন। পিরান্ডেলোর লক্ষ্য প্রেম-প্রীতি-হিংসা-দ্বেষ নয়, লক্ষ্য সত্যানুসন্ধান। বাস্তবতানুভূতির বিভ্রম যে সত্য-মিথ্যার প্রকৃত বিদারণ রেখা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করে না এই অস্বস্তিকর সিদ্ধান্তই তার প্রতিটি নাটকের প্রতিপাদ্য। এর নাটকের চরিত্রের আদল আলাদা, ঘটনার পরিচর্যা অভিনব। ব্রেখটের অত্যুগ্র উৎকণ্ঠা জীবনের নীতিগত উপলব্ধির অভিসারী, তাঁর প্রয়োগ-রীতি অদ্ভুত ও প্রতীকধর্মী হয়েও ষোলআনা রঙ্গমঞ্চীয়, গুরুগম্ভীর হয়েও রঙ্গময়। ফরাসি দেশের আনুই পিরান্ডেলোর স্বগোত্রীয়, ককতো নব নব রঙ্গমঞ্চীয় কলাকৌশলের আবিষ্কাবের মোহে বিভোর।

অস্বস্তি ও অসন্তোষের তবু শেষ নেই। পিরান্ডেলো, আনুই রেখট ও নবতর আধুনিক নাট্যচেতনার পিপাসা পুরোপুরি মেটাতে পারে নি। এমন নতুন নাট্যকারের আবির্ভাব হল যাঁরা প্রত্যেকেই পূর্বতন রীতি ঐতিহ্যের আপোষহীন ধ্বংসকারী। মুরুব্বি সমালোচকরা এইসব সর্বপ্রথা ভঙ্গকারী নাট্যকারদের কাণ্ডকারখানায় বিচলিত হয়ে— এদের অদৃষ্ট অশ্রুত ও অভাবিত প্রয়াসকে অসম্ভব নাটক নামে অভিহিত করে থাকেন। ফরাসি ভাষার আইনস্কো ও ইংরেজি ভাষার বেকেটই এই নবতম নাট্যধারার পুরোহিত। হ্যারল্ড পাইন্টার, এডওয়ার্ড এ্যালবি, জন আর্ডেন প্রমুখ সমকালের বহুসংখ্যক প্রখ্যাত নাট্যকার স্বকীয় শিল্পধর্ম পালনের

তাগাদায় একই পথের পথিক হয়েছেন। এঁদের নাটকে চরিত্র সৃষ্টির গতানুগতিক শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রয়াস অনুপস্থিত, কাহিনীর ধারাবাহিকতা অস্বীকৃত, পরিবেশের স্থানকালের পরিচর্যা অনিয়ন্ত্রিত, সংলাপ অসংবদ্ধ। অন্তত পুরাতন মানদণ্ডে এই রকমই মনে হওয়া স্বাভাবিক। অথচ এই নাটকই বর্তমানে বিশ্বজয় করেছেন। হ্যারাল্ড প্রিন্টারের দি লাভার নাটক আকারে অপ্রত্যাশিত রকম ছোট তিনটি চরিত্র মিলে এক পর্ব ব্যালের মতো এক একটি নৃত্যছন্দ সৃষ্টি করে। স্বামী, পত্নী, প্রেমিকা— এই হোলো তিন সত্তা। মঞ্চের কারসাজির দৌলতে নেচে ওঠে আলো, নাচে কথা, খেলা করে অব্যস্ত কামনার ছায়াবাজি। নিজের আবেগানুভূতির মতোই হাতের ছাতাটা ভাল করে মুচড়ে বন্ধ করে রাখা। ইংরেজ স্বামী শান্তকণ্ঠে নিজের বৌকে মামুলি প্রশ্ন করে তোমার প্রেমিক কি আজ আসছেন ? সংযত-পোশাক, নির্বিকার-আচরণ পত্নী সম্মতির উত্তরে শব্দ করে উম্‌ম। সদ্বিবেচক স্বামীও জানিয়ে দেয় যে সেও সন্ধ্যার আগে বাড়িমুখো হবে না। অবশ্য যাবার আগে প্রকাশ করে যায় যে কিছু সময় তাকেও এক বেশ্যার সঙ্গে কাটাতে হবে। বেশ্যারাই জানে কামনা জানাতে, কামনা জাগাতে। যে কামনা চতুরালি ভরা। দর্শকের কাছে সবটাই একটা পূর্বানুমোদিত পরিমার্জিত ভয়াবহ লেনদেনের মতো মনে হতে থাকে। এমনকি মনে হতে থাকে যেন চতুষ্পার্শ্বের ভদ্রভব্য সুসভ্য পরিবেশই নাটকের কেন্দ্রীয় দুর্বৃত্ত। পরের দৃশ্যে প্রেমিকের প্রবেশ ঘটে। সে অন্য কেউ নয়, স্বামীই। তবে এখন সে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। সে প্রেমিক। ঠোঁটের কোণে সিগ্রেট আলগোছে চেপে ধরে আছে, কোনো দুর্ধর্ষ নায়কের মতো। বনিতাও রূপান্তরিত হয়েছে বারবনিতায়। কামনা জাগানো শরীর সাপটানো ঘন কালো পোশাক অঙ্গে। দুজনেই মেতে ওঠে যৌনস্বপ্নময় নানা রঙ্গেবিভঙ্গে। আসন্ন সন্ধ্যায় মঞ্চ পরিণত হয় দুটি অনুরুক্ত জীবনের ক্রীড়াভূমিতে। নাটকের শেষে পালাবদল করে আবার যে যার প্রতিদিনের বর্ণহীন প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন করে।

বেকেটের নাটকের নামই 'দি প্লে'। এখানেও চরিত্র তিনটি— পতি, পত্নী ও প্রেমিকা। তিন জনেরই সারা শরীর তিনটি সংকীর্ণ মুখভাণ্ডের মধ্যে ঢোকানো, কেবল মাথা তিনটে বেরিয়ে রয়েছে। বোধ হয় তিনজনেই মৃত বলে কল্পিত। তিনজনই একটানা স্বগতোক্তি ও খণ্ডিত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পরস্পরের পূর্বতন সম্পর্কের জটিলতার বেদনা, কৌতুক ও দাহ বর্ণনা করে, আলোচনা করে, বিশ্লেষণ করে। অন্ধকার থেকে উদগত এক ফালি আলো এক মুখ থেকে অন্য মুখের ওপর ক্ষিপ্র গতিতে প্রতিফলিত হতে থাকে। সেই আলোকচ্ছটায় লাফালাফি কখনও প্রায় কৌতুকের পর্যায়ে পড়ে। একজন মুখের বাক্য শেষ না হতেই ছিটকে পড়ে যায় অন্য আরেকজনের দিকে, অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দেয় তৃতীয় ব্যক্তির গুঞ্জরণকে। সন্দেহ থাকে না যে সর্বদ্রষ্টার নেতৃত্ব থেকে এই রশ্মিফলকের উদ্ভব, যা অনবরত বিদ্ধ করে তিন শবকে। তখন তাদের জীবনের মতোই মরণও আধা-নারকীয় অস্বস্তিতে ভরে ওঠে।

আইনেস্কোর 'রাইনোসেরাস'-এ মানুষ গণ্ডারের দ্রুত গমন দেখে সন্ত্রস্ত হয়, কৌতূহল অনুভব করে এবং ক্রমশ মুগ্ধ হতে থাকে। গণ্ডারের প্রচণ্ড এবং প্রকাণ্ড অস্তিত্ব, তার সর্বসম্পদ লণ্ডভণ্ডকারী প্রমত্ত শক্তিমত্তার বিকাশ তার গগনবিদারী হুংকার এবং তার উদ্যত খড়্গের বীভৎস পরাক্রম ক্রমে সবই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রকে সম্মোহিত করে। গণ্ডার প্রেমে মগ্ন মানুষ আত্মবিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করে ক্রমশ পুরু ত্বকের অধিকারী হয়, পশুশক্তির উদগমে চঞ্চল হয়ে উঠে, চতুষ্পদের ব্যবহারে তার আগ্রহ জন্মে, কণ্ঠস্বরে জান্তব

কর্কশতা প্রবেশ করে, কপালের বর্তুলাকার মাংসপিণ্ড প্রলম্বিত ও অস্থিযুক্ত হতে থাকে—অফিসে, রাস্তায়, হোটেলে প্রান্তরে দলে দলে মানুষ অপ্রতিরোধ্য বেগে পুরোপুরি গণ্ডারে পরিণত হয়। নাটকের শেষ দৃশ্যে মঞ্চ ভবে যায় গণ্ডারে, কেবল স্থানাগারে আটক শেষ মানুষ বেরেঞ্জাব আত্মরক্ষার নিস্ফল চেষ্টায় আর্তনাদ করে, প্রতিবাদ জানায়; সে গণ্ডার হতে চায় না, সে গণ্ডার জীবনে মুক্তিলাভের অভিলাষী নয়। কিন্তু ক্রমশ তার চিৎকারের ভাষা কণ্ঠ বদলে যেতে থাকে। রুদ্ধ দুয়াবে সে প্রচণ্ড বেগে গুতো মারতে থাকে গণ্ডারের মতো, বিকৃত কণ্ঠস্বর গণ্ডারের গর্জনের মতো গমগম করতে থাকে। এইখানেই নাটক শেষ।

আইনেস্কোর আরেকটি নাটক 'দি পেডেস্ট্রিয়ান অব দি এয়ার'। এই নাটকেও কাহিনীব অনিয়ন্ত্রিত পল্লবায়ন আইনেস্কোর পরিচিত বেরেঞ্জারকে কেন্দ্র করেই পরিকল্পিত। এক শুভ প্রভাতে বেরেঞ্জার আবিষ্কার করল যে, সে বাতাসে ভর করে উড়তে পারে এবং সে উড়ে চলেও গেল আমাদের অভিজ্ঞতার বাস্তব সীমান্ত অতিক্রম কবে। পর্যটন শেষ করে যখন ফিরে এল তখন ওর অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা শুনে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। অতিক্রান্ত জগতের বন্ধকদের সে সহ্য করতে পারে নি, পালিয়ে এসেছে গগণচুম্বী গঙ্গাফড়িংদের আস্ফালন দেখে। এর চেয়ে তাব মতে বাস্তব দুনিয়ার কদর্যতা অনেক ভালো।

'দি কিলার' নাটকেও বেবেঞ্জার সব পেয়েছির দেশ থেকে পালিয়ে আসে কাবণ সে দেশেব নগব-নির্মাতা হৃদয়হীন এবং ঘাতকের কাণ্ডকাবখানা সেখানেও অপ্রতিহত। নিজেব পরিচিত নিরানন্দ নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন কবেও বেরেঞ্জাবের নিষ্কৃতি নেই। সে আবিষ্কার কবে যে অনুতাপ আচরণে অভ্যস্ত তার শান্ত-স্বভাব অসুস্থ শরীর পুরাতন বন্ধুটিই আসলে ঘাতক। এই ঘাতক আর তার শিকারেব পারস্পরিক অনুধাবনের অর্থযুক্ত ও অর্থহীন উন্মাদনাপূর্ণ দৃশ্য সম্পূর্ণ অপ্রাসংগিক পরিবেশের কোলাহলের পটভূমিতে জীবনের যে বহুবর্ণময় চলমান প্রতিকৃতি রচনা করে তার আবেদন কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না।

এই হচ্ছে আইনস্কো। চেতন নয় অবচেতনই যাঁর মঞ্চে স্বচ্ছ ও সজীব অবয়বে রূপান্তরিত হয়। আধুনিক চিত্রকলায় যে সত্য অনেক দিন আগে থেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল রঙ্গমঞ্চে তার অনুপ্রবেশ এতদিনে স্বীকৃতি লাভ করল। স্বাভাবিক ভাবনাব যুক্তিবশ্যতার নিয়ম এখানে অপসারিত। শুধু আছে নাট্যকারের আন্তরিক উপলব্ধির প্রচণ্ডতা, তাঁর প্রদীপ্ত অনুভবের উত্তাপ, তাঁর বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিপাতের বর্ণচ্ছটা। আর সবটাকে জুড়ে আছে একটা অতিকায় অবিশ্বাস্য অসঙ্গত কৌতুকমণ্ডিত শিশুসুলভ সরলতা।

এডোয়ার্ড এ্যালবিব নাটকও একপ্রকার তাই। 'হুইজ এ্যাফরেড অব ভার্জিনিয়া উল্‌ফ' নাটকে প্লট কাহিনী চরিত্র ঘটনা প্রায় কিছু নেই। এক প্রৌঢ় দম্পতি তাদের কল্পিত সন্তানের জীবনকাহিনী নিয়ে অনর্থক কলহ করে, পরস্পরকে অশ্লীল ভাষায় খামচে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে, তরুণ বয়সের অতিথি দম্পতির সঙ্গে অশোভন যৌনাচারে লিপ্ত হয়, অবিশ্রান্ত মদ্যপান করে এবং বারবার কেবল উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে ওঠে : হুইজ এ্যাফরেড অব ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, হুইজ এ্যাফরেড অব ভার্জিনিয়া উল্‌ফ! দুশ বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী লক্ষ্যহীন সংলাপ আধুনিক জীবনের সর্বাত্মক অর্থহীনতা, মত্ততা ও শূন্যতাকে এক করুণামণ্ডিত ভয়াবহ দৃশ্যরূপের মঞ্চে উদ্ভাসিত করে তোলে।

বেকেটের 'হ্যাপি ডেজ' নাটকের পটোন্মোচনে দেখতে পাই সুপুষ্ট বক্ষ এক মধ্যবয়সী রমণীকে তার কটিদেশ পর্যন্ত মাটির স্তূপের মধ্যে প্রোথিত। হয়ত ঘাসে ঢাকা উচ্চ ভূমিকার

কোটরে লুকোনো কোনো চোরা পাকে পড়ে গিয়ে ক্রমশ তলদেশে চলে যাচ্ছেন। স্তূপের অপর পাশে, দর্শকদের পেছন দিয়ে নির্বিকার চিত্তে স্বামী খবরের কাগজ পড়েন, রোদ বাড়তে থাকলে টুপি দিয়ে চোখ ঢাকেন, ক্লান্তিবোধ করলে অদৃশ্য হয়ে যান। স্ত্রী দাঁত মাজেন, ঠোঁটে রঙ মাখেন, চোখে চশমা এটে ঘাসের ফাঁকে গমনরত পিপীলিকা দেখেন, একটি সুখের দিনের স্মরণে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন। কেবল কথা বলেন এবং কথা বলেন। যুক্তিহীন, লক্ষ্যহীন সূত্রহীন। দ্বিতীয় দৃশ্যেও তাই। কেবল দেহ এবার পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আর অন্য কোনো বিকার কোথাও লক্ষ করা যায় না। সব শান্ত, সমাহিত, মন্থরগতি, মহিলা কথা বলেন, হাতের ব্যাগ খুলে ভিতরের জিনিসপত্র এলোমেলো চারধারে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে আবার সেগুলো গুছিয়ে তুলে রাখেন এবং কথা বলতেই থাকেন। স্বামীর কোনো সাড়া নেই। এখানেই নাটক শেষ।

এই আধুনিক নাটকের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান দুস্তর। তবু পৃথিবী প্রতিদিন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, সংস্কৃতির দুনিয়াত বটেই। পশ্চিমী নাটকের এই নবরূপের আস্বাদন কি আমাদের চেতনায়ও বিবর্তন ঘটাবে? সে বিবর্তন কি আমাদের জন্য সত্য হয়ে উঠতে পারবে, পারলে কি তা কাম্য বলে পরিগণিত হবে? কেবল প্রশ্নই করা যায়, সৃষ্টি প্রত্যক্ষ না করা অবধি উত্তর অনিশ্চিত হতে বাধ্য।

কেন লিখি নি

[ওজুহাত]

এখনও বয়স অল্প। পাণ্ডিত্য অর্জন করবার শক্তি কতখানি আছে গর্জন করে তা জাহির করার স্পৃহা তার চেয়ে অনেক বেশি। অইত যে কোনো সাংস্কৃতিক আসরের কথা শুনলে মন লালায়িত হয়ে ওঠে তাতে অংশগ্রহণের জন্যে। অনুপস্থিত সমালোচকের বাসি বিশ্লেষণের চেয়ে— স্বদেহে, স্বকর্ণে, স্বচক্ষে উপস্থিত সমঝদারদের বলা-না-বলা, আধবলা, হাসি, হাততালি, অভিমত প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর কাছেই পরম উপভোগ্য। যদিও আমি এখনও লিখতে শিখি নি, এমনকি শেখার প্রাথমিক সাধনার শক্তিও আয়ত্ত কবতে পারি নি, তবু সব লেখককে ভুয়ো আত্মস্তুতির ঐ মন্ত্রটাকে সুযোগ পেলেই জপতে শুরু করি। গতকাল তাই যখন অমিয়বাবু এই আসবেব খবব দিলেন তখনই ঠিক করলাম নাটক একটা লিখে ফেলব। মানে অনেক দিন থেকেই ভেতর থেকে একটা লেখার জ্বালা অনুভব করছিলাম। একটা খসড়াও মাথার ভেতর ঘুরঘুর করছিল। অথচ বাইরে থেকে তেমন একটা জোরালো তাগিদ পাচ্ছিলাম না। অমিয়বাবুর আন্তরিক সন্দেহ আমন্ত্রণ আর আমার গোপন আমিত্বের লোভ— দুয়ে মিলে কলম ধরতে বাধ্য করল। প্রায় ঘণ্টা ছয়েক চেষ্টা কবে দেড় পৃষ্ঠা লিখলাম। প্রথম দৃশ্যের প্রথম চরিত্রের প্রথম কথা অবধি তারপর সবটা ছিঁড়ে ফেললাম। কলকাতার বীভৎস হত্যাকাণ্ড নিয়ে নাটক লিখতে বসে আমি যা রচনা করেছি সেটা হয়েছে, নাট্যকলাব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিষ্প্রাণ, পঙ্গু, বিকলাংগ।

কেন হল ? অবশ্য এক্ষেত্রে উত্তর খুব সোজা। আমি লিখতে অক্ষম, হাত কাঁচা, রুচি অপরিণিত তাই, কিন্তু এ অক্ষমতাকে আমি যদি অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান লেখকদের ওপরও আবোপ করি এবং সমস্ত প্রশ্নটা যদি আমাদেব গত কয়েক বছরের প্রগতিশীল গণসাহিত্যের সামনে দাঁড় করাই তাহলে কতকগুলো খুব জটিল অস্বস্তিকর শিল্পগত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাব উদ্ভব হয়।

প্রশ্নটাকে আবো ধারালো এবং ঝকঝকে করে তুললেই সমস্যাগুলোর ধরন আঁচ করতে আমাদের খুব অসুবিধা হবে না। দেশের সুস্থ জনগণের প্রতিটা বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে গল্প উপন্যাস নাটক। ১৯৪৩-এ সাহিত্যে আমাদের সাহিত্যিকরা চেষ্টা করেছেন মন্বন্তরের ছবি আঁকতে। তারাশংকরের উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে পরিমল গোস্বামীব মহামন্বন্তরের ছোটগল্প সংগ্রহ বেরুল মাসিক পত্রিকায়, বিশেষ সংখ্যায় এমন আরও বেরিয়েছে অনেক রচনা। কিন্তু সত্যি কি এর বেশির ভাগ সাহিত্য হিসেবে মেকি এবং দুর্বল নয় ? মন্বন্তর তারাশংকরের সার্থক সৃষ্টি নয়। এর ঘটনা জীবনের সাথে তাল রেখে কোথাও দানা বেঁধে ওঠে নি। এর শেষ শিল্পগত অসম্পূর্ণতায়। ১৯৪৩ কিম্বা ৪৫ বস্ত্রসংকট নিয়ে মানিকবাবুও কোনো জায়গায় তাঁর নিজের ক্ষমতাব পূর্ণ ছাপ একে যেতে পারেন নি। তারাশংকরের 'তিনশূন্যে' মহামারীর যে ছবি আছে, মানিকবাবুর 'হাসিকে' অন্নহীন বিকলাঙ্গ

ভিক্ষুকের লেলিহান ক্ষুধার যে জ্বালা আছে তা দশবছরের সত্যিকারের বীভৎস মন্তরের সময় লেখা রচনায় কোথায় ? জীবনের ঐ ক্রূর সত্য রূপটি যখন বাস্তব জীবনে অত প্রকট হয়ে ফুটে উঠল, তখনকার সাহিত্যে তার কোনো শক্তি যুক্ত প্রতিফলন কেন খুঁজে পাই না ?

এ প্রশ্নটার গোড়াতেই যদি কোনো গলদ না থেকে থাকে তবে আমি এর উত্তর দাঁড় করাতে পারি—যেটা নিতান্ত আমারি মনগড়া—যেটার ভিত্তি সত্যি সাহিত্যের ওপর স্থাপিত তা নিজের আমি ঠিক বুঝি না। টমাস ম্যান তার Deth in Jenice গল্পের এক জায়গায় একটা কথা বলেছেন, সেটা আমার প্রস্তাবিত উত্তরের পক্ষে সহায়ক হবে বলে মনে করি। তিনি যা বলেছিলেন তার অর্থ অনেকটা এই রকম— শিল্পীকে যদি অন্যের দুঃখের কাহিনীর কথা রচনা করতে হয় তবে তাঁকে এক অর্থে অনভিজ্ঞ নিরপেক্ষ, নির্দয় হতে হবে। অন্যের দুঃখে যদি শিল্পী কেদেই ফেলেন তবে লেখার বুদ্ধির যোগান দেবে কে ? কাঁদতে কাঁদতে লেখা যায় না। মনের মধ্যে যদি লেখকের কোনো ব্যথা— আর সে ব্যথা যদি সৃষ্টির ব্যথা ছাড়া অন্য কোনো ব্যথা হয় তাহলে লেখা প্রাণ পাবে না। লিখবার সময় বাস্তব পৃথিবীর সত্যিকারের দরিদ্রটি সম্বন্ধে লেখকের মন যদি সমবেদনায় আপ্লুত থাকে তা হলে সেটা হবে ঐ চরিত্রাংকনের পথে একটু অলংঘনীয় অন্তরায়। লেখকের সহানুভূতি থাকা চাই শুধু তার কল্পনাব মানবটির সঙ্গে (তার সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক কী সে প্রশ্নের এখন প্রয়োজন নেই)। যত দুঃখজনকই হোক না কেন স্রষ্টার মনে তখন বিরাজ করছে একচ্ছত্র আনন্দ— সেই আনন্দের পথেই পূর্বায়বয়ব চরিত্রটি সত্যিকারের রূপ নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠবে।

এই সত্যকেই ভিত্তি করে আমি এগুতে চাই। কোনো কোনো সময় বাস্তব এত শক্তিশালী এবং প্রভাবময়ী হয়ে ওঠে যে স্বাভাবিক অবস্থাতেও তার বেড়াজালে শিল্পীও আর সবার সাথে জড়িয়ে যায়। জীবনের এই বন্ধন থেকে মুক্তি না পেলে চিন্তা বলে আলোকিত করে শিল্পী কী করে জীবনসত্যকে আবিষ্কার করবে ? কল্পনার এখানে ডানা কাটা, বাস্তব এখানে নৃশংস এবং নির্দয়। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবর্তে তলিয়ে যাচ্ছে শিল্পীর সুবেদী সহনশীল অনুভূতি। চিন্তার মান মনের জোর সব চরিত্রের জন্য কোনো অনুভূতিই আর উদ্ধৃত থাকে না। সবটা গ্রাস করে ফেলে রোজকার স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক। সাধারণের চেয়ে বেশি গ্রহণশীল শিল্পীর যে মন তা এখানে নিষ্ক্রিয়। তাইত তাঁর রচনা বাস্তবের চেয়ে দুর্বল এবং অবাস্তব।

কোলকাতার দাঙ্গা সম্বন্ধে আজই কোনো ভালো সাহিত্য রচনা হতে পারে এ কারণেই আমি তাতে সন্দেহ প্রকাশ করছি। কোলকাতার নরহত্যার জীবন ১৯৪৩-র মতোই শিল্পী-অশিল্পী সবাইকেই একভাবে প্রভাবিত করেছে। ডাস্টবিনের সামনে মানুষের কুকুরে ঝগড়া, ফ্যান নিয়ে ভাঙা হাড়ির ওপর মায়ে মেয়ে চুলোচুলি— এ নিয়ে ১৯৪৩ কি তার আশেপাশেও যতই চেষ্টাই চলুক না কেন মহৎ সাহিত্য তৈরি হতে পারে সন্দেহজনক। এখনও এগুলো প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা যে কোনো ভোতা অনুভূতিও এ দৃশ্যে শিহরণ অনুভব করছে— এর মধ্য দিয়ে জীবনের সারসত্য উদঘাটন খুব বড় শিল্পী ছাড়া এখন সম্ভব নয়। তাইতো আমাদের পাকিস্তান লেখকরা এগুলো এড়িয়ে গেছেন বেশি— আর বাকি বেশির ভাগ লেখকের লেখায় এগুলো এসেছে সাময়িক গতানুগতিকায়ত দুষ্ট বদ অভ্যাস হিসেবে এবং পরে নতুনত্বের লোভে প্রাথমিক উত্তেজনার এ হয়েছে সাহিত্যের বাস্তব জীবনের কল্পনাহীন অনুকরণের বিকৃত ফল। সাহিত্যে বাস্তবতার বিকৃত ব্যাখ্যা এ হয়েছে একটি রূপ। কলকাতা দাঙ্গা আমাদের সবার মনে এখনও রক্ত আখরে লেখা। এ নিয়ে আজই কাব্য রচনা

করা যায় না। কল্পনায় এ দৃশ্যকে গড়ে তুলবার আগেই বাস্তব ঘটনা হুড়মুড় করে ওর ওপর পড়ে সমস্ত সৌধ তছনছ্ করে দিচ্ছে। শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক হবার কোনো উপায় নেই। তার সামাজিক সত্তা আজ এ বিষয়ে তার শিল্পীর মনের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে অপারগ।

বাস্তব পৃথিবীর হুবহু অনুকরণটা সাহিত্যে বাস্তবতা নয়। বাস্তব পৃথিবীকে কল্পনায় রূপায়িত করে নতুন অনুভূতিতে পুনর্জীবিত করে খণ্ডজীবনের মধ্যে সৃষ্টিরহস্যের সত্যটি ধরে দেয়াই শিল্পীর ক্ষমতার পরিচয়। Ben Jonson-এর alchemist সমসাময়িক লন্ডনের খুটিনাটিতে ভরা। তবু তার বাস্তবতা Shakespeare কে স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখে না।

সাময়িকতাটা গুণ না হয়ে দোষ হয়ে দাঁড়ায় বলেই এটা এত নিন্দিত। সাময়িকতাটাকে গুণে পরিণত করতে হলে তাই চাই একটা অপরিহার্য নূতনতম সময়ের ব্যবধান। আজ থেকে আরও পাঁচ বছর হয়ত ১৯৫৩ শের মন্বন্তর নিয়ে সার্থক রচনা সৃষ্টি হলে।[১] বাস্তবতা তখন কল্পনার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে উন্মুখ হয়ে থাকবে। সকলের দৈনন্দিন স্বাভাবিক উদ্যম থেকে নিজেকে ইচ্ছামতন বিচ্ছিন্ন করে শিল্পী জীবনসত্য উদঘাটনের অনাবিষ্কৃত পথটি খুঁজে পাবেন, আবশ্যকীয় অনুভূতি দিয়ে সাজিয়ে জীবনকে শক্তিশালী করে তুলতে পারবেন। সার্বিক সাহিত্য জীবনেরই কিংবা জীবনের চেয়ে শক্তিশালী রূপ নিয়ে প্রকাশ পাবে।

---

১. Great Calcutta Killing day নিয়ে ভালো সাহিত্য রচনা হবার সময় আসতে আসতে হয়তো সাম্রাজ্যবাদীর আরো কয়েকটা নরহত্যার মিশন বিমানযোগে এদেশে এসে ফিরে যেতে পারবে। এ্যানা মেগার্সের Seventh cross, Ellenbarg-এর Fall of Paris, Rainbow এগুলো আকস্মিক আবির্ভাব।

চোর

চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। ভাবে ও ব্যকারণে একটি সাধারণ বাক্য। প্রথমে ভাব বিচার করা যাক।

চোর অলস নয়। তার জীবন কর্মময়। আমাদের সারা দিন কত কাজ থাকে, মন দিয়ে করি না। চোরের দিনরাত সমান। সে সদা জাগ্রত।

গৃহস্থ ঘুমায়, চোর জেগে থাকে। রাত যত বেশি গভীর হয়, চোর তত বেশি সজাগ হয়। চোর ডাকাত নয়। সে নরহত্যা করে না। তার নীতি আর রাজার নীতি আলাদা। চোর ঢাকী নয়, সে নীরব কর্মী। আমরা অনবরতই ঢাক-ঢোল পেটাই। নিজেরত বটেই, অন্যেরও। প্রতি পদক্ষেপে চোরকে চিন্তা করতে হয়, বুদ্ধি খাটাতে হয়। আমাদের মাসকাবারি বেতরের চাকরিতে অত খাটুনি কেউ করে না। চোরের কদর না করে উপায় কী?

কথা ও কাহিনীর মধ্যে কথার মূল্য বেশি। কাহিনীতে রস বেশি। চোর যে কাহিনীর কাঙাল নয় এটা ওর ধার্মিকতার লক্ষণ। তাছাড়া একা চোরকে দোষ দেব কোন অধিকারে? কে কার কথা শোনে? প্রেমে অনেক জ্বালা, সে কথা কি প্রেমিক শোনে? বিশ্বের কথা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শোনে? এখন সকলেই জানে যে, কথা মাত্রেই শোনা কথা। শোনা কথা সোনার দরে বিকোয় না।

প্রবাদে উল্লেখিত চোরের বিশিষ্ট স্বভাব যে কেবল ধার্মিকতার লক্ষণযুক্ত তাই নয়, দার্শনিকতামণ্ডিতও বটে। কথা শোনার, বিশেষ করে সৎকথা শোনার নিষ্ফলতা সম্পর্কে তার মনে কোনো দ্বিধা নেই। সে জানে যে তুচ্ছ ধন-দৌলত বিতরণে মানুষ্য মাত্রেরই হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অথচ প্রত্যেকেই নিজের অমূল্য চিন্তাধারা অকাতরে বিলিয়ে দিতে চায়। এ জন্যে চোরের অনেক মাথাব্যথা। কে না জানে যে কথায়, মানুষের মন দূরে থাক, চিড়ে পর্যন্ত ভেজে না। অথচ উপদেশ দান যার ব্যবসা তিনি ধরে নিয়েছেন যে, তাব বাণী শ্রবণ ক'রে সকলের হৃদয় পবিত্র ভাব ধারণ করবে এবং তার ফলে সকল কর্মই পুণ্যময় হবে। এরকম হতে চোর কখনও দেখে নি। শোনেও নি।

ভালো কথার ভক্ত আমরা সকলেই, কিন্তু কাজ করি যে যার মতলব মতো। করি, যে তার কারণ এই নয় যে আমরা জ্ঞানহীন। ধর্মের কথা কখনই দুর্বোধ্য নয়। করণীয় কর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য গবেষক হতে হয় না; গণ্ডগোলের পীঠস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী না হলেও চলে! তার নির্দেশ পথে-ঘাটে বিবেকে, থাকলে, অষ্টপ্রহর গুতো মারে। অবশ্য তাতে কেউ চিৎপাৎ হয়ে পড়ে যায় না। মিথ্যে কথা বললে পরকালে বহুতর এনাম মিলবে এমন কাহিনী কোনো ধর্মেই নেই, কিন্তু তাই বলে কি মিথ্যা কথার মহিমা মনুষ্যলোকে বিন্দুমাত্র দীপ্তিহীন হয়েছে, প্রণয়ে প্রবঞ্চনা শাস্ত্রানুমোদিত নয় তাই বলে কি মানব-মানবী তার অন্যথা করে? স্কুটারের মিটারে ত ভাড়া ছাপার হরফে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে, তাই বলে কি তা কখনও মান্য হয়? কোনো চাকরিতেই এমন শর্ত বেঁধে দেয়া নেই যে, ফাইলে ফাইলে

ফিতের গেরো দিয়ে গেলেই কার্যসিদ্ধি হবে, অথচ আমরা কি তার অতিরিক্ত কিছু করতে তৈরি থাকি ? চোরের বিজ্ঞতার বেশি প্রমাণ জড় করা অনাবশ্যক। জ্ঞানের অভাবের জন্য আমরা পাপচারণ করি একথা সত্য নয়। আসলে আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতিই ভিন্ন! যে বস্তুর আমাদের অভাব নেই, উপদেশদাতৃগণ সে বস্তুই আমাদের আরও বেশি করে দান করতে চান। এটা ঠিক নয়। তেলে মাথায় তেল ঢালা হোক চোর, তা চায় না। চোরের কর্ণপাত না করার এইটিই হল মূল কারণ।

বাংলা ভাষার এই ভাবপূর্ণ প্রবাদের ব্যাকরণও অনন্যসাধারণ। বাংলা শব্দার্থ, পদগঠন ও পদক্রমের মামুলি সূত্রসমূহ এখানে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে লংঘিত হয়েছে। প্রথমেই দেখুন চোর পদটি। চোর বিশেষ্য এবং বাক্যের কর্তা। বাংলায় কর্তৃত্ব সাধারণ চিহ্নহীন বা বিভক্তিশূন্য। কিন্তু এখানে যুক্ত হয়েছে এ বিভক্তি। ভাষাতত্ত্বের ঐতিহাসিক বিচারে এই লাংগুলের উদ্ভব সংস্কৃতের ভাববাচ্য নির্দেশক এন থেকে। চোরবংশ যে কত প্রাচীন ও অভিজাত এ তার এক পরোক্ষ প্রমাণ। পাঠভেদে চোরের পরিবর্তে কখনও কখনও চোরা বা চোরায় পর্যন্ত পাই। ঐ অন্ত্য আকারও স্নেহ বা প্রশ্রয়সূচক। তারপর পদক্রম বিচার করুন। শিষ্ট বাংলায় না-বাচক অব্যয় ক্রিয়ার পরে ব্যবহৃত হয়। এখানে পূর্ববর্তী উপস্থাপনার দ্বারা ভাবে প্রবলতা সঞ্চারিত করা হয়েছে। শোনা এবং পালন করা একই অর্থে ব্যবহার করি। এটা আমাদের মানসিক অসতর্কতা এবং অসাধুতার লক্ষণ। চোর তার চেয়ে অনেক বেশি সৎ ও সতর্ক। গ্রহণ করা দূরে থাক, সে শুনতে পর্যন্ত রাজি নয়। এই মনোভাবই আমাদের সকলের অন্তরকে বিশেষ সততার সঙ্গে প্রতিফলিত করে। প্রকৃতই চোর আমাদের মর্মের সহোদর।